নিবেদন

সুধী পাঠক সহজেই বুঝবেন যে এই গ্রন্থের সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক। কোন ব্যক্তি গোষ্ঠী বা সংস্থাকে উপহাস করবার জন্য এই গ্রন্থ রচিত হয়নি, আনন্দ পরিবেশনই এই রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য।

রম্যাণি

বি. এফ. ৭৭, সল্টলেক সিটি,

কলিকাতা-৬৪

গ্রন্থকার

এই লেখকের লেখা

ছোট গল্প

অয়ি অবগুন্ঠনে, কী মায়া, গল্প শুধু গল্প

●

ভ্রমণের গল্প

সুন্দর নেহারি, কেরালার উপকূলে

●

ভ্রমণ কাহিনী

তীর্থের পথে, রূপমতীর দেশে, কানাড়া দেখা হল না, তীর্থ পরিচয় (যন্ত্রস্থ)

●

ভ্রমণ সংকলন

শ্রীসুষমা চক্রবর্তীর সহযোগিতায়

শতবর্ষের পথযাত্রা

●

ভ্রমণ উপন্যাস

মণিপদ্ম, তুঙ্গভদ্রা, একজন লামা ও মানস সরোবর, আরও আলো, কুটিল কুমায়ুন, কাশ্মীরী বাহার, তিন পাহাড়

●

উপন্যাস

রূপম ?, সেই উজ্জ্বল মুহূর্তে, একটি আশ্বাস, জনম জনম, মেঘ, কল্কিরুবাচ, আয় চাঁদ, তারার আলোর প্রদীপখানি, বাঁধ ভেঙে দাও, মৌন-মন, তারা ভেসে চলেছে, চোখের আলোয় দেখেছিলেম, একটি নাটক নিয়ে, তিনজন নায়িকা (যন্ত্রস্থ)

●

ছোটদের জন্য

আমাদের দেশ

উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মহিসুর ও তামিলনাড়ু

●

শাশ্বত ভারত

দেবতার কথা, ঋষির কথা, অসুরের কথা ও উপদেবতার কথা

●

কল্যাণি বীক্ষ্য

●

বিষ্ণুপুরাণ (সারানুবাদ)

●

কোথায় ঈশ্বর (যন্ত্রস্থ)

কবি-বন্ধু শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্যকে

প্রিয় দেবরাজ, আমার এই পত্রখানি আপনি অত্যন্ত গোপনে মনে মনে পড়বেন এবং পড়া হলেই তা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে আপনার ছিলিমের আগুনে পুড়িয়ে ফেলবেন। পত্রখানি আমি 'অত্যন্ত গোপনীয়' মার্কা করব ভেবেছিলাম, কিন্তু তার বিপদের কথা ভেবে প্রায় খোলা চিঠি হিসেবেই পাঠালাম। এর প্রধান কারণ, এখানে খোলা চিঠি কেউ পড়ে না, কিন্তু গোপনীয় চিঠিগুলি সেন্সর বোর্ডের কৃপায় প্রায়শই মারা যায়। বোর্ড মানে তক্তা নয় দেবরাজ, এই দপ্তর নিরীহ পত্রগুলি আটকে বিপদজনক বিদেশী পত্রগুলি না দেখেই পাচার করে। কোন চিঠি মারা যাওয়ার দরকার থাকলে তা 'গোপনীয়' মার্কা করা হয়। অর্থাৎ সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না।

এর পরে আমি একটু ছোট হরফে লিখছি দেবরাজ। এ জায়গাটা আপনি আপনার তৃতীয় নেত্রে অর্থাৎ ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস লাগিয়ে পড়বেন। কাটাকুটিও একটু বেশি করছি এই জন্যে যে এখনকার তাড়াহুড়োর যুগে এই অংশের উপরে কেউ আর চোখও বুলোবে না। আমি এই পত্র আপনাকে কুম্ভীপাক নরক থেকে লিখছি। প্রতি দিন যা দেখতে পাচ্ছি তা আপনাকে আভাষে ইঙ্গিতে জানাব। এখানে এখন ধর্মরাজের শাসন আর নেই, ধর্মরাজের নামে জনতাই দেশ শাসন করছে। জানতে পেরেছি যে প্রথমেই তারা আমার ভাই মনুর লেখা সংহিতাখানা আগুনে পুড়িয়ে পাপপুণ্যের সংজ্ঞা বদলে নিয়েছে। এখানে পাপ এখন সংযমের নাম, আর মন যা চায় তারই নাম পুণ্য। কুম্ভীপাকে তাই

এখন পাপী নেই, সবাই পুণ্যবান। পুণ্যবান নাম শুনে আপনি যেন ভুল করবেন না। ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন তো! যৌবনে যে সব কাজ করে আপনি এখানে আসতেন, এখন আর তা করে কুম্ভীপাকের গেট খোলা পাবেন না। আমার বোন অহল্যার কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। আপনার ভয়ে আমার পিতা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা মর্ত্যের জিতেন্দ্রিয় ঋষি গৌতমের আশ্রমে তাকে রেখে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন। অহল্যার জন্যে আপনি গৌতমের আশ্রমের চারি দিকে ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু সেকালের ধ্যান ধারণায় কুমারী অহল্যা সর্বদা সতর্ক থাকত বলে আপনি কিছু সুবিধা করতে পারেন নি। গোলমাল করেছিলেন গৌতমের সঙ্গে তার বিয়ের পরে। আপনি গৌতম সেজে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু অহল্যা আপনাকে চিনতে পারে নি বলে মনে হয় না। তাই কুম্ভীপাকের মতে পাপী গৌতম এই পুণ্য কাজের জন্যে তুজনকেই শাপ দিয়েছিলেন। এই ঘটনা এখন ঘটলে গৌতমেরই ফাঁসি হত, আর আপনি অহল্যাকে নিয়ে বিমানে রৌরব ও ক্ষারকর্দম নরকও ঘুরে আসতে পারতেন। জনতা সরকারই আপনাদের তুজনের খরচ দিত। কী সুব্যবস্থা দেখুন! কুমারী কন্যা নিয়ে কুম্ভীপাকের পিতামাতার আর কোন তুর্ভাবনা নেই। জন্মাবার পর থেকেই ছেলেমেয়েদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ শেখানো হচ্ছে। গোলমাল প্রকাশ হয়ে পড়বার কোন আশঙ্কা নেই, আর অসতর্কতার জন্যে সে সম্ভাবনা দেখা দিলেও তুর্ভাবনার কিছু নেই। তার জন্যে নার্সিং হোম আছে। সেখানে এমন ব্যবস্থা যে কাকপক্ষীও কিছু জানতে পারবে না।

কিন্তু না দেবরাজ, এ ভাবে লিখে কুম্ভীপাকের প্রশস্তি আমি শেষ করতে পারব না। আমার অভিজ্ঞতার কথা আমি গোড়া থেকেই বলি, তাতে আপনারও বুঝতে সুবিধা হবে।

আমি যে আমার পুরনো ঢেঁকি ভেঙ্গে কুম্ভীপাকে পড়েছিলাম, তা

বুঝতে আমার যথেষ্ট সময় লেগেছিল। আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান হবার পরে দেখলাম যে আমি একটা খাট ভর্তি বিরাট ঘরে শুয়ে আছি, আর চারি দিক থেকে নানা রকমের কাৎরানির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে বগলে আমার সারাক্ষণের সঙ্গী বীণাটি নেই। এই বীণা বাজিয়ে হরিনাম করে আমি ত্রিভুবনে ঘুরে বেড়াই। যন্ত্রটি হারিয়ে আমি বাঁচব কী করে! দেহের কষ্টের কথা ভুলে আমি বীণার শোকে কাৎরে উঠলাম: বীণা! বীণা কোথায়?

আমাকে ডাকছেন?

বলে এক সুন্দরী কন্যা আমার কাছে ছুটে এল ত্বরিত পদে। তার মুখের দিকে চেয়ে আমার মনে হল যে আমি যেন অম্বরীষ রাজার কন্যা শ্রীমতীকে দেখছি। সেই রূপ, সেই দৃষ্টি, সেই তীব্র আকর্ষণ! শ্রীমতী কি আমার জন্যে এখানে পুনর্জন্ম নিয়েছে!

শ্রীমতী আমার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নাড়ি টিপে দেখল। তারপর কপালে হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করল: ডাকছিলেন কেন?

আমার সারা দেহে রোমাঞ্চ হল। মনে পড়ে গেল অতীতের কথা। শ্রীমতীর স্বয়ম্বর সভায় হরি আমার সঙ্গে রসিকতা করেছিলেন। শ্রীমতী আমার গলায় যখন বরমাল্য দেবেন ভাবছিলেন, তখন হরির মায়ায় আমার মুখখানা নাকি বানরের মতো দেখাচ্ছিল। তাই শ্রীমতীকে আমি পাই নি। পেলে আমিও গৃহী হতে পারতাম। সারা জীবন এই ভাবে ঢেঁকিতে চেপে বীণা বাজিয়ে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াতে হত না।

শ্রীমতী আমাকে তাড়া দিয়ে বলল: কী কষ্ট হচ্ছে বলুন!

কোন কষ্টের কথা আমার মনে এল না। আমি চোখ বুজে অলস ভাবে বললাম: বীণা, আমার সাধের বীণা!

মুহূর্তের মধ্যে কী ঘটে গেল জানি না। শ্রীমতী এক ঝটকায় আমার হাতটা সরিয়ে দিল। অবিলম্বে চোখ মেলে আমি তার

আরক্ত মুখ দেখলাম। ক্রোধে বা অপমানে বিরক্ত হয়ে শ্রীমতী দূরে চলে গেল। কিন্তু কেন সে এমন রেগে গেল, তা বুঝতে পারলাম না।

আমার পাশের খাটে শুয়ে যিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন, তিনি গুরু গম্ভীর স্বরে বললেন: এটা হাসপাতাল।

হাসপাতাল!

হ্যাঁ, হাসপাতাল। প্রেম করার জায়গা এটা নয়!

এই প্রেম কথাটি শুনে আমি চমকে উঠলাম। ইনি কি অন্তর্যামী! আমার মনের গোপন কথাটিও ইনি জানতে পেরেছেন! ত্রিলোকের এ কোন্ লোক! আর হাসপাতালই বা কী! তল অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল ও রসাতল নামে সপ্ত পাতালের নাম আমি জানি। কিন্তু হাসপাতাল নাম আমি এখানেই প্রথম শুনলাম। পরে জেনেছিলাম যে কুম্ভীপাকে চিকিৎসালয়কে হাসপাতাল বলে। অন্তর্জলি যাত্রার প্রথা উঠে গেছে বলেই মুমূর্ষুদের এই হাসপাতালে আনা হয় শ্মশান যাত্রার পূর্বে। ডেথ সার্টিফিকেট দেবার জন্য এখানে অনেক ডাক্তার আছেন। ডাক্তার একটি সম্মানের উপাধি। একশো জন মেরেই বৈদ্য হওয়া যায়, কিন্তু ডাক্তার হতে হলে কম পক্ষে এক সহস্র জীব হত্যা করতে হয়। যারা আমাদের সেবায় রত, তারা নার্স; কিন্তু তাদের সিস্টার বা ভগিনী বলে সম্বোধন করতে হয়। এটি সরকারী নিয়ম। তাঁরা চান না যে আমরা রোগীরা বা ডাক্তাররা এদের সঙ্গে প্রেম করেন। কিন্তু আমি তো মুখে কোন প্রেমের কথা বলি নি। এই কথা বলতেই ভদ্রলোক বললেন: সেবিকা সৎপথীর ডাকনাম যে বীণা তা জানেন না!

আজ্ঞে না।

তবে অমন গদগদ হয়ে—

বাধা দিয়ে আমি বললাম: আমার কচ্ছপী বীণা সারাক্ষণ আমার বগলে থাকে। ওটা বাদ্যযন্ত্র।

ভদ্রলোক আরও গম্ভীর হয়ে বললেন: হ্যাঁ, বিপদে পড়লে সবাই এই রকম এক-একটা মন-গড়া কৈফিয়ৎ দিয়ে থাকে।

লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল দেবরাজ। আমি আর কোন কথা বলতে পারলাম না। মর্ত্যের মানুষও আমার ঢেঁকি ও বীণার কথা জানত, আমাকে নিয়ে ছড়া কেটে বলত—

পাখা নাহি তবু ঢেঁকী উড়িয়া বেড়ায়।
কোণের বহুড়ী লয়ে কোন্দলে জড়ায়॥
সেই ঢেঁকী চড়ে মুনি কান্ধে বীণাযন্ত্র।
দাড়ী লড়ে ঘন পড়ে কোন্দলের মন্ত্র॥

আমাদের এই ঘরটি এমন উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত যে, দিন কি রাত তা বোঝবার উপায় ছিল না। খাটের উপরে কিছু রোগীর নাক ডাকার শব্দে মনে হচ্ছিল যে এখন বোধ হয় মধ্যরাত্রি। হঠাৎ একজন সুপুরুষকে দরজার কাছে দেখতে পেলাম। তাঁর গলায় একটি স্টেথস্কোপ ঝোলানো দেখেই বুঝতে পারলাম যে তিনি একজন ডাক্তার। পরে জেনেছিলাম যে এই যন্ত্রটি গলায় ঝোলানো থাকলে যে কোন রোগিণীর বক্ষ অনাবৃত করে তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। কিন্তু আমাদের এই ঘরে কোন রমণী ছিল না। আমাদের বুক পরীক্ষা করতে তিনি আসেন নি। দেখলাম যে তিনি সেবিকা সৎপথীর নিকটে গিয়ে কোন প্রস্তাব করতেই আতঙ্কে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবং পরক্ষণেই ছিটকে সরে গিয়ে এক বৃদ্ধ রোগীর শিয়রের কাগজপত্রে মনোনিবেশ করল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ডাক্তার একটি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করে প্রস্থান করলেন। তারপর সেবিকা সৎপথী তার আসনে ফিরে গেল।

রাতে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালবেলায় ঘুম ভাঙল কোন রমণীর মড়া কান্নায়। আমার মতো অনেকেই ভেবেছিলেন যে

এই ঘরেই কেউ শ্মশান যাত্রা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানা গেল যে এ ঘরে কারও কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। মড়া কান্নার শব্দ আসছে পাশের কোন ঘর থেকে। এক সময়ে এই কান্না আরও অনেক রমণীকণ্ঠের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রচণ্ড কোলাহলে পরিণত হল। বারান্দায় ঘন ঘন পদশব্দ ও নানা রকমের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে মনে হল যে কাছেই কোথাও খণ্ড যুদ্ধ বেধেছে এবং অবিলম্বে এই যুদ্ধ সমগ্র হাসপাতালে ছড়িয়ে পড়বে।

বাহিরে হঠাৎ এক জোড়া ভারি জুতোর শব্দ পেয়েই আমি উৎকর্ণ হলাম। গুরুগম্ভীর স্বরে কেউ আদেশ দিলেনঃ চেপে যাও সব, বাচ্চাটা সরিয়ে ফেল। কাগজের রিপোর্টাররা এসে পড়লে কেলেঙ্কারি চারি দিকে ছড়িয়ে পড়বে।

কাগজের রিপোর্টারের নামেই কেলেঙ্কারির কথা ছড়িয়ে পড়ল। হাসপাতালে পালিত কয়েকটি ধেড়ে ইঁদুর রাতে একটি নবজাত শিশুকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে। প্রথমে আমরা মায়ের কান্না শুনেছিলাম, তারপরে আরও কয়েকটি মায়ের চেঁচামেচি। কর্তৃপক্ষ কর্মীদের দায়ী করতে চেয়েছিল, আর কর্মীরা দায়ী করেছিল কর্তৃপক্ষকে। তারা বলছে যে অবস্থা আয়ত্তে আনবার চেষ্টা না করলে ইঁদুরগুলো মায়েদেরই খেতে শুরু করবে।

এবারে আমার পাশের ভদ্রলোক আমাকে বললেনঃ শুনলেন তো! এরপরে আমাদের পালা।

আমাদেরও খেয়ে ফেলবে?

একে খেয়ে ফেলাই বলে। এই হরি ঘোষের গোয়ালে পড়ে থাকলে একজন একজন করে আমাদেরও গঙ্গাযাত্রা করতে হবে।

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আমি বললামঃ তাহলে আমরা কী করতে পারি?

পয়সা থাকলে সবই পারেন। একটা কেবিন ভাড়া করে নিজের পছন্দ মতো নার্স রাখতে পারেন। তখন আর বীণার জন্যে আপনাকে

দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে না। তারাই আপনার কাছে সারাক্ষণ পড়ে থাকবে। দরকার হলে আপনার বাড়িতে গিয়েও দেখাশোনা করবে। সবই এখানে পয়সার খেলা। উহু-হু-হু—

বলে তিনি হঠাৎ ককিয়ে উঠলেন। আর আমি বললাম : কী হল ?

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পরে তিনি বললেন : দেখলেন সুপটু সেবাব্রতীকে ! একবার ফিরেও দেখল না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম : সে আবার কে ?

তিনি বললেন : আপনার সেবিকা সৎপথীর জায়গায় এসেছে সুপটু সেবার্ব্রতী। তারপরে আসবে মধু মনোরঞ্জনা। পালা করে এরাই তিনজন আমাদের দেখাশুনো করছে।

তারপরেই প্রশ্ন করলেন : আপনার নামটা যেন কী ?

বললাম : ব্রহ্মপুত্র দেবর্ষি।

বড় বিদ্‌ঘুটে নাম তো ! পেশা কী

হরিনাম গান।

কীর্তনিয়া ?

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনার নাম ?

মসীজীবী মল্ল।

এ তো আরও বিদঘুটে নাম।

কিন্তু আমার পেশার কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। আমি যে কলমের জোরে খাই, তা নাম দেখেই বুঝতে পারবেন।

বললাম : বেদব্যাসের মতো বই লেখেন আপনি ?

মসীজীবী বললেন : পাগল নাকি ! অন্যের কথায় আমরা লিখব ! আমরা হলাম কেরাণী। ইচ্ছে হলে লিখব নইলে হাত গুটিয়ে বসে থাকব। বেদব্যাসের বাবাও আমাদের লেখাতে পারবে না। তা দেবর্ষি মশায়, আপনি এখানে এসেছেন কেন ?

বললাম : তা তো জানি নে।

সেকি। আমার মতো বাস থেকে ছিটকে পড়েছেন, না ওঁর মতো মার খেয়েছেন মস্তানদের হাতে, তা জানেন না?

তারপর চুপিচুপি বললেনঃ বুড়ো বয়সে ভীমরতি! মেয়ে ঘটিত ব্যাপার!

মসীজীবী আমার অন্য ধারের ভদ্রলোককে দেখিয়ে ছিলেন। তাঁকে আমি চোখ মেলতে দেখি নি। তবে কষ্টে মুখ বিকৃত করতে দেখেছি কয়েকবার, আর গলার মধ্যে থেকে ঘড় ঘড় করে এক রকমের শব্দও বেরোতে শুনেছি। আমি সত্য কথাই বললামঃ ব্রহ্মলোক থেকে ইন্দ্রলোকে যাবার পথে আমি ঢেঁকি ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছিলাম। চোখ মেলে দেখছি এইখানে আপনার পাশে শুয়ে আছি।

দাঁড়ান দাঁড়ান, ব্যাপারটা ঠিক মতো বুঝে নিই। ব্রহ্মলোক ইন্দ্রলোক নাম তো শুনি নি! রৌরব মহারৌরব তামিশ্র অন্ধতামিশ্র ক্ষারকর্দম অসিপত্রবল ঘোর কালসূত্র অবীচিমৎ—

বাধা দিয়ে আমি বললামঃ এ সব তো নরকের নাম!

তবে?

ব্রহ্মার নাম শোনেন নি? ব্রহ্মলোকের নাম?

দাঁড়ান দাঁড়ান, নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে!

এ কথা শুনে বড় আনন্দ হল আমার। কুম্ভীপাকের পুণ্যবানেরা তাহলে আমার পিতা সৃষ্টিকর্তার নাম এখনও ভোলে নি!

মসীজীবী খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেনঃ সেদিন এক সভায় বক্তৃতা শুনেছিলাম— বিদ্রোহী আমি, বিদ্রোহী সুত—ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া—ব্রহ্মলোক কি এরই কাছে?

আমি 'হ্যাঁ' বলতেই তিনি তাঁর খোলা হাতখানি আমার দিকে বাড়িয়ে বললেনঃ আপনার পায়ের ধুলো দিন দেবর্ষি মশায়, আপনি নমস্য ব্যক্তি। বাসে উঠতেই আমরা সাহস পাই নে, আর আপনি উড়োজাহাজে চেপেও জান নিয়ে ফিরে এসেছেন! এ শুধু আপনার নয়, আপনার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি!

আমি তাঁকে বলতে পারলাম না যে আমার চোদ্দ পুরুষ নেই, আমার আগে মাত্র একটি পুরুষ, তিনিই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। আর উড়োজাহাজ নামের কোন যানেও আমি চড়ি নি, আমি আকাশ পথে উড়ে যাচ্ছিলাম আমার ঢেঁকিতে চড়ে। ব্রহ্মার নাম যে শোনে নি, তাকে আমি ঢেঁকির ব্যাপারটা বোঝাতে পারব না। কিন্তু মসীজীবী তাঁর দুর্ঘটনার কথা আমাকে সহজেই বুঝিয়ে দিলেন। অফিসে যাবার তাড়ায় বাসের হাতলটা তিনি শক্ত ভাবে ধরতে পারেন নি। আর পাদানিতে একটি পা তোলবার আগেই অন্য যাত্রীর ধাক্কায় ছিটকে পড়েছিলেন অনেকটা দূরে। আর উঠে দাঁড়াতে পারেন নি। কিছু সহৃদয় পথচারী তাঁকে রিক্সায় তুলে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দেবরাজ, এই অফিস ও যানবাহনের কথা আমি আপনাকে যথা সময়ে বলব। এখন হাসপাতালের কথাই বলি। আমাদের চিকিৎসার জন্য তখন একাধিক ডাক্তার ও নার্স ঘরে ঢুকেছিলেন। তাঁদের দেখতে পেয়ে আমরা তটস্থ হয়ে গিয়েছিলাম।

দেখতে না দেখতেই তাঁরা আমাদের কাছে এসে গেলেন। মসীজীবী মল্লের শিয়রে দাঁড়িয়ে প্রবীণ ডাক্তার বললেন: ছবি কোথায়?

একজন তরুণ ডাক্তার উত্তর দিলেন: স্টকে ফিল্ম নেই বলে দেরি হচ্ছে।

'হুঁ' বলে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: কোথায় চোট লেগেছে?

আমি আমার কোমরটা একটু তোলবার চেষ্টা করতেই বললেন: কোমরের একটা ছবি নাও।

বলে অন্য ধারে এলেন। ইনি কতকটা আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছেন দেখে তাঁর পেটে একটা খোঁচা মারলেন। ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে ঘড় ঘড় করে একটা শব্দ বেরোল; কিন্তু চোখ মেলে তিনি চাইলেন না। তরুণ ডাক্তার বললেন: একটু বেশি অ্যাটেনশন চাইছেন।

'ও' বলে তাঁরা এগিয়ে গেলেন এবং এই ভাবেই সমস্ত রোগীকে পরীক্ষা করে তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মসীজীবী মল্ল এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এইবারে বললেন: দেখলেন ব্যাপারটা?

দেখলাম।

কী দেখলেন?

বললাম: সবাইকে পরীক্ষা করে গেলেন। কিন্তু আমার কোমরের ছবি নেবেন কেন বলুন তো?

বোধহয় আপনার কোমরের হাড় ভেঙেছে।

অ্যাঁ! বলেন কী! এই বয়সে কোমরের হাড় ভাঙলে আমি উঠে দাঁড়াব কী করে?

কিছুক্ষণ থেকেই দুটি যুবক দরজার বাইরে থেকে উঁকি ঝুঁকি মারছিল। এইবারে চোরের মতো সন্তর্পণে আমাদের দিকে চলে এল। আমার পাশের অচেতন ভদ্রলোকের মুখের কাছে মুখ নামিয়ে তাঁর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চলছে কিনা তাই দেখল। তারপরে তাঁর গায়ে মাথায় খানিকটা হাত বুলোতেই ভদ্রলোক চোখ মেললেন। একজন উৎফুল্ল হয়ে প্রশ্ন করল: কেমন আছেন দাদু?

কিন্তু ভদ্রলোক কোন উত্তর না দিয়ে লক্ষ্যহীন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

অন্য যুবকটি আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল: আপনার কী কষ্ট?

আমি কাতর কণ্ঠে বললাম: আমার বোধহয় কোমরের হাড় ভেঙেছে।

আর ওঁর?

জানি নে।

ডাক্তার কিছু বলেন নি?

বললাম: ওঁদের ম্লেচ্ছ ভাষা আমি বুঝতে পারি নি।

আমার পাশের ভদ্রলোক আবার চোখ বন্ধ করেছেন দেখে অন্য যুবকটিও আমার কাছে চলে এল। বলল: দীনবন্ধু ভদ্র মশায়কে দেখবার কেউ নেই, অথচ ওঁর মতো ভদ্রলোক আমরা আজও দেখি নি।

যুবকটি তার মুখ আমার কানের কাছে এনে বলল: বলবেন না কাউকে। এ সমস্তই শক্তিশেল সমাজপতির কাজ। গুণ্ডারা পাড়ার একটা সুন্দর মেয়েকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। তার চিৎকার শুনে ভদ্রমশায় এগিয়ে গিয়েছিলেন।

তারপর?

তারপর আর কী! মেয়েটাকেও আটকাতে পারলেন না, নিজেও মার খেয়ে মরলেন। মনে হচ্ছে, ওঁর শিড়দাঁড়া ভেঙেছে। আপনারাই দেখবেন ওঁকে। সত্যিই ওঁকে দেখবার আর কেউ নেই।

ওঁর পরিবার?

ছেলেমেয়েরা কে কোথায় থাকে জানি নে তো, ওঁর স্ত্রী ওঁকে অনেক দিন আগেই ত্যাগ করে গেছেন।

কেন?

উনি পাড়ার সবার সুখদুঃখ দেখতেন বলে ওঁর স্ত্রী ওঁকে কোন দিনই পছন্দ করতেন না। ভদ্র মশায়ের যে বন্ধু তাঁদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন, এখন তিনি তাঁরই সংসার করছেন।

অন্য যুবকটি মুখ নামিয়ে বলল: এ সব কথা যেন কাউকে বলবেন না।

আমাদের কথাও বলবেন না কাউকে। আমরা এখানে যাতায়াত করছি জানতে পারলে শক্তিশেল সমাজপতি আমাদের পেছনেও গুণ্ডা লাগাবে।

বললাম: তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আমি ওঁর ভার নিলাম।

এই সময়ে বাইরে থেকে অনেক লোক আমাদের ঘরে ঢুকছিলেন। তাই দেখে যুবক দুটি আমাকে নমস্কার করে বলল: আমরা আসি তাহলে।

বলেই তারা চোরের মতো পদক্ষেপে পালিয়ে গেল। আর এক মহিলা এলেন মসীজীবী মল্লের নিকটে। তাঁকে দেখতে পেয়েই মসীজীবী বললেন: তুমি একা এসেছ! খোকা কোথায়?

মহিলা তাঁর খাটের এক ধারে বসে বললেন: সে ক্রিকেট খেলা দেখতে গেছে।

তবে প্যানপেনির সঙ্গে এলে না কেন?

সে বেড়াতে গেছে তার বন্ধুর সঙ্গে।

মসীজীবী চেঁচিয়ে উঠলেন: সেই ছোঁড়াটা আবার আসতে শুরু করেছে! এবারে আমি তার ঠ্যাং ভেঙে দেব।

বলে ডান হাতখানা তুলতে গিয়েই উহু-হু-হু করে আর্তনাদ করে উঠলেন।

খুবই সুসজ্জিত ম্লেচ্ছ বেশে এক ভদ্রলোক কাছে এসেই বলে উঠলেন: তোমার নাকি কাঁধের হাড় ভেঙেছে! তা মরতে এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছ কেন? এখানে কি তোমার কাঁধ জোড়া লাগবে, না কোন দিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে?

মহিলা কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললেন: কী করব দাদা! রাস্তার লোক ওঁকে এখানেই ভর্তি করে দিয়ে গেছে।

তা ছবি-টবি উঠেছে?

মসীজীবী বললেন: না। স্টকে ফিল্ম নেই বলছে।

ভদ্রলোক একটা ভেংচি কেটে বললেন: নিচে একটা ফুলের তোড়া পেলুম না, তো ফিল্ম। কিন্তু খবরদার, ছবির জন্যে তাড়া দিও না যেন। তাড়া দিলেই অন্য কারও ছবি দেখে তোমার চিকিৎসা করবে। ঘেঁটুর কথা মনে নেই? ওর ডান পা ভেঙেছিল, ছবির জন্যে তাড়া দিতে অন্যের একটা ছবি দেখে ওর বাঁ পায়ের চিকিৎসা হল হাসপাতালে। সে আর উঠে দাঁড়াতে পারল না। তারপরে নার্সিং হোমে গিয়ে পা কাটিয়ে এখন হাঁটি-হাঁটি করে হাঁটছে। একটা পা আবার ছোট হয়ে গেছে।

মহিলা এবারে কেঁদে উঠে বললেনঃ দোহাই তোমার দাদা, তোমরা থাকতে ওঁর অবস্থা যেন সে রকম না হয়!

ভদ্রলোক বললেনঃ আমার এখন অফিসের তাড়া আছে, তা না হলে এই বেলাতেই আমি ওকে নার্সিং হোমে পাঠাবার ব্যবস্থা করতাম। এখানে পড়ে থাকলে কি আমাদের মান থাকবে!

বলে তিনি চলে গেলেন।

মহিলা কাঁদতে কাঁদতে বললেনঃ শুনলে তো!

মুখখানা হাঁড়ির মতো করে মসীজীবী মল্ল বললেনঃ শুনলাম সবই। কিন্তু নার্সিং হোমের খরচ তো তোমার দাদা দেবে না! আর আমি বসে আছি শুকনো ডাঙার ওপরে, ঢেউ গুণে আর কত রোজগার হয় বল!

আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এই মহিলা মসীজীবী মল্লের স্ত্রী এবং যে ভদ্রলোক চলে গেলেন তিনি তাঁর সম্বন্ধী। এইবারে আর এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেনঃ আমিও সব শুনেছি মসীজীবী, নার্সিং হোম তোমার আমার জন্যে নয়। আর বড়লোক আত্মীয় থাকলে বিপদ আরও বেশি। তার চেয়ে যা করলে কাজ উদ্ধার হয়, তারই চেষ্টা আমি করব।

মসীজীবী সাগ্রহে বললেনঃ কী করবে?

ভদ্রলোক বললেনঃ হাসপাতালের ডাক্তাররাও তো তোমার মতো শুকনো ডাঙায় বসে ঢেউ গুণছেন। যিনি তোমার ছবি তুলবেন, তাঁর চেম্বারে গিয়ে একটা ফী দিয়ে আসব। আর যিনি তোমাদের ছবি হচ্ছে না দেখে নিজের কাজে নার্সিং হোমে দৌড়চ্ছেন, তাঁকেও তাঁর চেম্বারে একটা ফী দিয়ে আসব। দিনকাল যা হয়েছে, এ ছাড়া আর কোন উপায় দেখছিনে।

মসীজীবী তাঁর কান্না সামলে বললেনঃ তাই কর ভাই, নার্সিং হোমে নিয়ে গেলে আমাকে ধনে প্রাণে মরতে হবে।

তোমার দুঃখ আমি বুঝি ভাই। আমিও তো কেরাণী! বলে দু হাত জুড়ে নমস্কার করে বললেন—

বৈদ্যরাজ নমস্তুভ্যং যমরাজ সহোদর।
যমস্তু হরতি প্রাণান্ বৈদ্য প্রাণান্ ধনানি চ॥

আর এঁরা তো বৈদ্য নন, এঁরা ডাক্তার, যমরাজের সাক্ষাৎ সহোদর। যম শুধু প্রাণটা নেন, কিন্তু এঁরা মারেন ধনে-প্রাণে।

মসীজীবী মল্ল কাতর স্বরে বললেন: হাসপাতালে তোমাদের থাকার সময় বোধহয় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। অফিসে যাবার আগে তোমার বৌদিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাও।

আসুন বৌদি।

বলে দুজনে বেরিয়ে গেলেন।

মসীজীবী মল্ল এবারে আমার দিকে চেয়ে বললেন: বুঝতে পারলেন কিছু? ইজ্জতের প্রশ্ন উঠে পড়েছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: চিকিৎসার জন্যে আবার ইজ্জতের প্রশ্ন কেন!

মসীজীবী বললেন: আপনার গোলকে না থাকতে পারে, কুম্ভীপাকে আছে। আমরা এখন বিনি পয়সার খাটে শুয়ে আছি, পয়সা দিলে অন্য খাটে, আরও বেশি দিলে কেবিনে। চিকিৎসা ভাল হলেও সমাজে আপনার মান থাকবে না। যত বেশি পয়সার নার্সিং হোমে যাবেন, তত বেশি মান। সে সব জায়গায় আপনার সমস্ত আত্মীয়স্বজন একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। শুধু আপনার নয়, তাদেরও ইজ্জৎ বাড়বে তো!

বললাম: তাহলে সেখানেই যান না!

মসীজীবী একটা ভেংচি কেটে বললেন: তাহলে এতক্ষণ শুনলেন কী! বিয়ের সময়ে শ্বশুরের গলায় গামছা দিয়ে যা আদায় করেছিলাম, তাই বেচে বেচেই তো এত দিন লৌকিকতা চালিয়েছি। আমার চিকিৎসার জন্যে কি বউ-এর গায়ে আর কোন গয়না আছে!

কিন্তু—

গিন্নীর গায়ে যা দেখলেন, ও সবই ঝুটো, গিল্টির গয়না। ও

গয়না চোরেও নেয় না। ভুল করে নিলে তার পরিশ্রমের জন্যে একটা চড় মেরে ফিরিয়ে দেয়।

লৌকিকতা কী?

বলে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

মসীজীবী বললেন: লৌকিকতাও জানেন না? কী আশ্চর্য! জন্মের আগে থেকে এই লৌকিকতা শুরু হয়, মরেও তার শেষ নেই। সাধভক্ষণে গিন্নীর নিমন্ত্রণ! উপহার কিনে তাঁর হাতে দিয়ে পাঠান। নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছে। ফুল দিয়ে আসুন। ছেয়েমেয়ে হয়েছে! মুখ দেখে উপহার দিন। তারপর অন্নপ্রাশন, বছরে বছরে জন্মদিন, উপনয়ন, বিয়ে, বিবাহ-বার্ষিকী, তারপরে তাদের সন্তানদের মুখ দেখা। চিতায় তুলে দিলেও লৌকিকতার শেষ নেই। খাটিয়ায় ফুল দেবেন, ছেলেদের দেবেন ফুল, ফল, মিষ্টান্ন, কাপড়। তারপর শ্রাদ্ধে ও বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বাসরে যাবেন সাদা ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে। নিজে মরলেই লৌকিকতার শেষ।

বলে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজলেন।

দুপুরের আহারের সময়ে একটি খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেল কিছু রোগীর সঙ্গে এই হাসপাতাল কর্মীদের। অখাদ্য পরিবেশন করা হয়েছে বলে একজন রোগী নাকি বলেছিল, তোমরা সব চোর। আমাদের ওষুধ বাজারে বেচছ। আর আমাদের এই অখাদ্য দিয়ে নিজেরা সব লুটেপুটে খাচ্ছ।

এই অভিযোগের উত্তরে হাসপাতালের কোন কর্মী নাকি বলেছিল, যত সব লাট সাহেবের ব্যাটা এসে এইখানে জুটেছে! নিজের বাড়িতে কে কী খায় আমরা যেন জানি না।

এই নিয়েই হল বাকযুদ্ধ। কিন্তু রোগীরা শয্যা ছেড়ে উঠতে পারল না বলে হাতাহাতি হল না। কথার বারুদ ফুরিয়ে যাবার পরেই ব্যাপারটা মিটে গেল। এ নাকি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। পুরনো রোগীরা এ সব কানে তোলে না।

দীনবন্ধু ভদ্রের থালা পড়ে রইল। তিনি চোখ মেলেও দেখলেন না। সুপটু সেবাব্রতীকে ডেকে এই কথা বলে উত্তর পেলাম: এ হল আদিখ্যেতা।

মসীজীবী মল্ল একটা ভেংচি কেটে বললেন: হল তো! পরের জন্যে কেন যে এমন দরদ, তা বুঝিনে।

রাতে দীনবন্ধু ভদ্রের অবস্থার অবনতি হল। মনে হল, কোন যন্ত্রণায় আরও কাতর হয়েছেন তিনি। মাঝে মাঝেই একটা ঘড় ঘড় করে শব্দ শুনেছি। কিন্তু শব্দটি এমন যে কারও দৃষ্টি তাতে আকৃষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু আমি স্থির থাকতে পারলাম না। একবার মধু মনোরঞ্জনাকে নিকটে দেখে তাকে এই কথা বললাম। সে কিছু দেখে বলল: এটা স্বভাবের দোষ।

বলে চলে গেল।
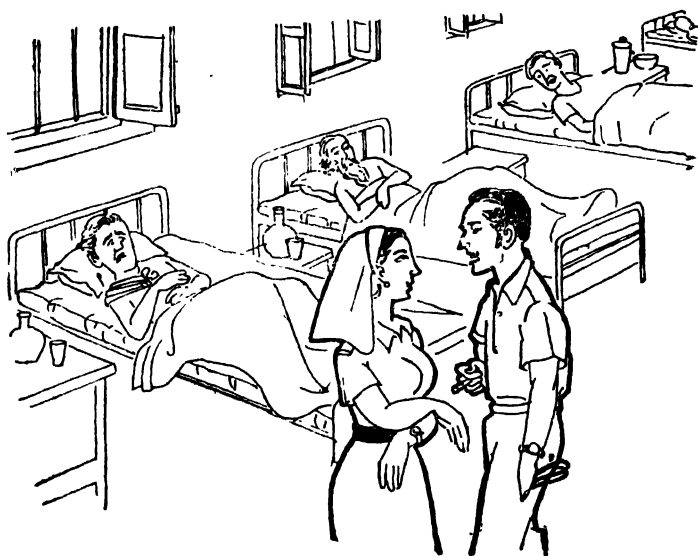
মধু মনোরঞ্জনার কাছে এসে···

মসীজীবী মল্ল এবারেও সব দেখলেন। তারপরে বললেন: এ

বয়সেও স্বভাবের দোষ গেল না! কাছাকাছি সুন্দরী মেয়ে দেখলেই ছটফট করে ওঠেন দেখছি!

কথাটা তিনি যে আমাকে বললেন, তা বুঝতে পারলাম। কিন্তু কোন উত্তর দিলাম না। দীনবন্ধু ভদ্র রাতের আহারও ছোঁন নি। আমার পাশের খাটে শুয়ে তিনি মরে যাবেন, এ আমি ভাবতে পারছিলাম না।

রাত তখন অনেক হয়েছিল। গত রাত্রির সেই তরুণ ডাক্তারটিকে আমি দরজার নিকটে দেখেই ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। মধু মনোরঞ্জনার কাছে এসে কিছু বলতেই সে লজ্জায় মাথা নিচু করল। আর আমি তখনই 'বাবা রে মা রে গেলাম রে' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম।

দুজনেই চমকে উঠে এক সঙ্গে আমার কাছে ছুটে এলেন। আমি দীনবন্ধু ভদ্রকে দেখিয়ে বললাম: এই ভদ্রলোক মরে যাচ্ছেন।

ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষার জন্যে এগিয়ে যেতেই মধু মনোরঞ্জনা বলল: সারাক্ষণ এঁরা এই রকম করছেন।

ডাক্তার তাঁর নাড়ি টিপে উত্তাপ দেখে বিরক্ত মুখে ফিরে গেলেন।

তাঁরা ফিরে যেতেই মসীজীবী মল্ল বললেন: আপনার মাথাটা কি খারাপ?

কেন বলুন তো?

বারে বারে করছেন কী? বুক পেট নাড়ি দেখে কি এ কালের চিকিৎসা হয়? ছবি চাই, রিপোর্ট চাই, মল মূত্র রক্ত পরীক্ষা, তারপর তো চিকিৎসা!

কিন্তু তত দিন কি ইনি বাঁচবেন?

ভদ্রলোক বললেন: তাই যদি মনে করেন তো এক কাঁড়ি পয়সা নিয়ে নার্সিং হোমে চলে যান না। পয়সা ফেললেই সব পরীক্ষা এক সঙ্গে হয়ে যাবে!

আর পয়সা না থাকলে?

মরুন কাৎরে কাৎরে!

বলে তিনি চোখ বুজলেন।

সেবিকা সৎপথী এল মধ্য রাত্রে। সমস্ত রোগীদের সে ঘুরে ঘুরে দেখল। আমার কাছে আসতেই আমি বললাম: দীনবন্ধু ভদ্র বোধ-হয় বাঁচবেন না।

কেন?

সারা দিন তাঁর কোন চিকিৎসা হয় নি।

সে তখনি তাঁর কাছে গিয়ে পরীক্ষা করল অনেক যত্নে। মনে হল দীনবন্ধু ভদ্র একবার চোখ মেলে তাকে দেখলেন। কোন কথা বলতে পারলেন না।

সেবিকা সৎপথী বলল: এঁর তো শুধু হাড় ভাঙার কষ্ট নয়। অন্য কিছুর জন্য ইনি এত কষ্ট পাচ্ছেন। কোন ওষুধ পড়ে নি? ইন্‌জেকশন?

আমি বললাম: না।

ব্যস্ত ভাবে সেবিকা সৎপথী অন্য ঘর থেকে একজন প্রবীণ নার্সকে ডেকে আনল। তারপরে দুজনে যুক্তি করে ডাক্তারের নামে কল বুক পাঠাল।

কিন্তু কল বুক ফিরে এল, ডাক্তার এলেন না। বোধহয় কোন নির্দেশ এসেছিল। সেই নির্দেশ মতো ওষুধ খাওয়ানো হল। তারপরেই অবস্থার আরও অবনতি হল। ভয় পেয়ে সেবিকা সৎপথী আবার কল বুক পাঠাল ডাক্তারের কাছে। এবারে আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

আমার মনে হল যে দীনবন্ধু ভদ্রের নাভিশ্বাস উঠেছে। এ কথা মনে হতেই আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। কোমর ভাঙ্গার কথা ভুলে গিয়ে আমি খাট থেকে নেমে পড়লাম। তারপরে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। আমার নিজের কোন কষ্ট বোধ হল না। দীনবন্ধু ভদ্রের কষ্টেই মন আমার আচ্ছন্ন হয়েছিল। আমি অন্ধকারে

আনাচে কানাচে ডাক্তারকে খুঁজতে লাগলাম।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে যেন মধু মনোরঞ্জনার গলার স্বর শুনতে পেয়েছি। এ কথা মনে হতেই আমি গলা খাকারি দিয়ে ডাকলাম: ডাক্তারবাবু!

সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর গলার প্রশ্ন এল: কে?

আমি। আমি ব্রহ্মপুত্র দেবর্ষি।

আলোয় দাঁড়িয়েছিলাম আমি। মধু মনোরঞ্জনা তাই আমায় চিনতে পেরে বলল: সেই বুড়োটা।

অত্যন্ত রুক্ষ স্বরে ডাক্তার বললেন: তা আপনি এখানে উঠে এসেছেন কেন?

সাহসে ভর করে আমি বললাম: দীনবন্ধু ভদ্রের নাভিশ্বাস উঠেছে।

ডাক্তারকে আমি ঠিকই বলেছিলাম দেবরাজ, ফিরে গিয়ে তাঁকে আর আমি দেখতে পাই নি। তার আগেই সেবিকা সৎপথী তাঁর মুখের উপরে একখানা সাদা চাদর ঢেকে দিয়েছিল। সারা রাত তিনি আমার পাশের খাটে পড়ে রইলেন। আমার চোখে ঘুম এল না। আমি আপনার কথাই ভাবতে লাগলাম।

আপনার রাজ্যে অশ্বিনীকুমাররা তো বসেই আছেন। আর নেচে নেচে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে উর্বশী মেনকারা। অশ্বিনীকুমারদের তত্ত্বাবধানে আপনিও একটি হাসপাতাল খুলুন, দেবরাজ। দেবতারাও তো সব বুড়ো হয়েছেন। আপনিও গেঁটে বাতের ব্যথায় মাঝে মাঝেই কষ্ট পান। সে সময়ে হাসপাতালে এসে উর্বশীদের সেবা নেবেন। ব্যথা না কমুক, মন আপনার প্রফুল্ল হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের মতো হরি ঘোষের গোয়ালে না থেকে আপনি কেবিনে থাকবেন। উর্বশীরা পালা করে আপনার সেবা করবে।

পর দিন দীনবন্ধু ভদ্রের মৃতদেহ সৎকারের জন্য নিয়ে যেতে কেউ এল না। দুজন ডোম এসে চাদরে জড়িয়ে দেহটা নিয়ে গেল। কোন

ভাগাড়ে ফেলে দেবে, না বৈতরিণীর জলে ভাসিয়ে দেবে, তা হরিই জানেন।

কিন্তু মসীজীবী মল্ল বললেনঃ এ ভালই হল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললামঃ কেন?

নিজের ঘরে মরে পড়ে থাকলে তো কেউ জানতেই পেত না, পচা গন্ধ পেয়ে পাড়ার লোক এসে দরজা ভেঙ্গে ব্যাপারটা জানত।

তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেনঃ রৌরব ক্ষারকর্দম থেকে কুম্ভীপাকে যে সভ্যতা আমদানি হচ্ছে, তাতে আমাদের শেষ দশাও এর চেয়ে কিছু ভাল হবে না।

দীনবন্ধু ভদ্রের খাট বেশিক্ষণ খালি রইল না। কাল রাতে বারান্দায় অনেক রোগীকে পড়ে থাকতে দেখেছি। তাদেরই একজনকে এনে শূন্য খাটে শুইয়ে দিয়ে গেল। হাসপাতালের সব কাজ চলতে লাগল যথা নিয়মে। যেন কিছুই হয় নি, এমনি ভাবে। মনে মনে আমি স্থির করেছিলাম যে এই হাসপাতালে আর নয়, অন্ধকার একটু গভীর হলেই আমি এই স্থান ত্যাগ করব। কিন্তু অন্ধকার যখন গভীর হল তখন আমার সেবিকা সৎপথীর কথা মনে পড়ল। বড় বিষণ্ণ দেখেছিলাম তাকে। তাই কোন সান্ত্বনার কথা বলে যাবার জন্যে মন আমার উন্মুখ হয়ে উঠল। ঠিক করলাম যে সে আসবার পরেই আমি হাসপাতাল ত্যাগ করব।

কিন্তু সেবিকা সৎপথী এল না। তার জায়গায় যে এল, তার কাছেই জানতে পারলাম যে দীনবন্ধু ভদ্রের মৃত্যুর জন্যে তাকেই দায়ী করেছেন কর্তব্যরত ডাক্তার। কর্তব্যে অবহেলার জন্যে তদন্ত সাপেক্ষে তাকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে, দোষ প্রমাণ হলে তার চাকরি যাবে।

আমি বলে উঠলামঃ কিন্তু কল বুক পাঠিয়ে যে ডাক্তারকেই পাওয়া যায় নি!

মসীজীবী মল্ল চুপি চুপি বললেনঃ কল বুক ঐ ডাক্তারই সরিয়ে

ফেলেছে।

কেউ না বলুক, আমি সত্য কথা বলব, আমি সাক্ষী দেব তদন্তে।

মসীজীবী মল্ল একটা ভেংচি কেটে বললেন ঃ আপনাকে সাক্ষী দেবার জন্যে কে ডাকবে?

মনশ্চক্ষে আমি আমার শেষ দিনটি দেখতে পেলাম। আমারও স্ত্রী-পুত্র পরিজন নেই। দীনবন্ধু ভদ্রের মতো আমিও এই জীবনে একা। এখানে মৃত্যু হলে ডোমেরা আমার মৃতদেহও কোন ভাগাড়ে বা বৈতরিণীর তীরে ফেলে দিয়ে আসবে। শেয়ালে শকুনে আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

কুম্ভীপাকের পুণ্যবানদের জন্যে আমার দুঃখ হল। এ দৃশ্য কি তারা কল্পনা করতে পারছে না! তবে কেন নতুন সভ্যতা আমদানি করছে রৌরব ও ক্ষারকর্দম থেকে?

মাথা তুলে দেখলাম যে মসীজীবী মল্ল এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। আরও অনেকে নিদ্রামগ্ন। খুব সন্তর্পণে খাট থেকে নেমে আমি ঘরের বাহিরে বেরিয়ে এলাম। চারি দিক নির্জন। কেউ আমাকে বাধা দিল না। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আমি উন্মুক্ত আকাশের নিচে চলে এলাম। এই আকাশ আমার চেনা, এই বাতাসে আমি মুক্তির আস্বাদ পেলাম।

সদর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে আমার ভয় হল। তাই একটা অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে পড়লাম। তারপরেই আমাকে থমকে দাঁড়াতে হল। অন্ধকারে পথের ধারে বসে আসে সেবিকা সৎপথী। তাকে দেখেই আমার প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম, ক্ষমা চেয়ে নেবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। কিন্তু তার পরেই তার বিপদের কথাও মনে পড়ে গেল। কিন্তু তাকে এই রকম অসহায় ভাবে ফেলে গেলে আমার চলবে না। তাই কাছে গিয়ে ডাকলাম ঃ বীণা!

বীণা চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল। তার দু চোখে জল ছলছল করছে।

বললাম ঃ তুমি ভয় পেও না বীণা, আমি তোমার তদন্তে সাক্ষী দিতে এসে সত্য কথা বলব।

বীণা একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল ঃ আপনার সত্য কথা কে শুনবে ঠাকুরমশায়! সত্য কথা তো কেউ শুনতে চায় না, সৎ কাজও কেউ চায় না। ডাক্তার সুখব্রত বৈদ্যের কথায় রাজী হলে আমাকে তিনি দায়ী করতেন না।

আমি কী, বলব ভেবে পেলাম না। বীণাকে হরি নাম করতে বলব! না সে এবারে বিদ্রূপ করছি ভাববে! চোরের মতো পালিয়ে গিয়ে আমি আত্মরক্ষা করব ভাবলাম। কিন্তু জানতাম না যে হরি আমাকে বিদ্রূপ করবার জন্যে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। বীণার সঙ্গে বারে বারে আমার দেখা হবে এবং শেষ বারে আমি আর পালাতে পারব না।

দেবরাজ, আমার প্রথম পত্রটি আপনি পেয়েছেন কিনা জানি না। জানবার কোন উপায় নেই। যত দিন কুম্ভীপাকের সঙ্গে আপনার টেলিফোন যোগাযোগ না হচ্ছে, তত দিন এই ভাবে চিঠি লিখেই আমাকে কাজ চালাতে হবে, আর চিঠি মারা যাবার ভয়ে অল্প অল্প করে আপনাকে কুম্ভীপাকের কথা জানাতে হবে। আপনার রাজ্যে টেলিফোন নেই, কিন্তু টেলিফোন কুম্ভীপাকের একটি মস্ত আবিষ্কার। শুধু একটি নম্বরের দরকার। সেই নম্বর মিলিয়ে আপনি যার সঙ্গে খুশি, স্বকণ্ঠে কথা বলতে পারেন এবং উত্তর শুনতে পারেন। দূরত্ব কোন বাধাই নয়। আপনার দৌরাত্ম্যে ঝড় বৃষ্টির খেলায় কুম্ভীপাকের খেলা মাঝে মাঝেই জমে উঠে। একজনের নম্বর আর একজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তখন কোন পুরুষ হয়তো তাঁর অফিস থেকে পরস্ত্রীকে কিছু গোপন কথা কইলেন; নম্বরের গোলমালে শুনে ফেললেন তাঁর নিজের স্ত্রী। তেমনি কোন কুমারী কন্যা হয়তো তার পুরুষ বন্ধুকে কোন গোপন জায়গায় ডাকল, নম্বরের গোলমালে যে একাধিক লোক তা শুনল, তার মধ্যে হয়তো তার পিতাও আছেন। কিন্তু

কুম্ভীপাকের পুণ্যবানেরা এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা চেঁচামেচি করে অনেক চেষ্টাতেও কোন নম্বর না পেলে। এত সুবিধা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষকে দিন রাত গালাগালি করে।

কিন্তু আমি আপনাকে চিঠির কথা বলছিলাম। একখানি চিঠিতে সব কথা লেখা নিরাপদ নয় দুটি কারণে। প্রথম কারণটি আপনার জন্যে। চিঠিখানি আপনার হাতে না পড়ে যদি অন্য কারও হাতে পড়ে, তাহলে আপনার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। কুম্ভীপাকের প্রগতির কথা জেনে আপনার রাজ্যেও দেবতারা নানা রকমের আন্দোলন শুরু করবেন। এই বয়সে আপনি আর কিছুই সামলাতে পারবেন না। দ্বিতীয় কারণ আমি নিজে। চিঠিখানা যদি কুম্ভীপাকেই মারা যায় তো আমার সব পরিশ্রম বৃথা হবে। বুড়ো বয়সে লেখার অভ্যাস তো আর নেই। অনেক কষ্টে এই চিঠি আপনাকে লিখছি।

কুম্ভীপাকে চিঠি মারা যায়, দেবরাজ। কিন্তু তার জন্যে কাউকে দায়ী করা যায় না। আমি স্বচক্ষে দেখে এই কথা বিশ্বাস করেছি।

সেবিকা সৎপর্ণীর কাছ থেকে আমি যখন পালিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন একটি পুকুরের পাড়ে আমি এক পুণ্যবানকে দেখতে পেলাম। সে একটি ভারি বস্তা জলে নিক্ষেপ করে উঠে আসবার সময় আমাকে দেখতে পেয়ে আত্মগোপনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু লুকোবার কোন জায়গা ছিল না বলেই আমার হাতে ধরা পড়ে গেল।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: কিসের জন্যে আমাকে ভয় পাচ্ছ বাবা?

আমার গায়ে নামাবলী দেখে সে বলল: ঠাকুরমশায়! তা আপনি এখানে এত রাতে!

আমি তাকে সত্য কথাই বললাম: হাসপাতাল থেকে আমি পালাচ্ছি বাবা! কিন্তু তুমি কী করছিলে?

কাউকে বলবেন না তো ঠাকুরমশায়!

আমি তাকে অভয় দিয়ে বললাম: না।

লোকটি বলল ঃ আপনার কাছে মিথ্যা বলে আমি পুণ্য বাড়াব না। সরকারী চিঠি পাওয়া যায় না বলে সবাই চেঁচামেচি করে। তার জন্যে দায়ী আমরাই। সব চিঠি সবার কাছে আমরা পৌঁছে দিতে পারি না। আমি ডাক পিওন, ডাক বিলি করাই আমার কাজ। কিন্তু সারা দিনের চেষ্টাতেও আমরা কাজ শেষ করতে পারি না।

কেন ?

ঝড় জল রোদ মাথায় করে সারা দিন আমি ছুটে বেড়াই। তারপরে ক্লান্ত হয়ে দেখি আরও অনেক চিঠি আমার হাতে রয়ে গেছে। পর দিন সেই চিঠি হাতে করে ডাকঘরে যাবার সাহস হয় না বলে ঘরের কোণায় ফেলে রেখে যাই। এমনি করেই আমার ঘরে চিঠি জমে। তারপরে এক দিন নিজের চাকরি বাঁচাবার জন্যে সেই সব চিঠি বস্তায় ভরে জলে ফেলে দিয়ে যাই।

আমি বললাম ঃ সত্যিই তো, এর কোন প্রতিকার নেই ?

প্রতিকারের চেষ্টা আমি করেছিলাম। কিন্তু সরকার লোক বাড়াতেও রাজী নয়, কোন যানবাহন দিতেও রাজি নয়, তাতে নাকি সরকারের খরচ বেড়ে যাবে। কিন্তু চিঠি পাঠাবার খরচ সরকার বাড়িয়েই যাচ্ছেন।

তাহলে কি কোন দিনই অবস্থার উন্নতি হবে না ?

হবে।

তার এই উত্তর শুনে আমি খুশী হয়ে বললাম ঃ কী করে হবে ?

আমার এই পুণ্যের কথা বেশি দিন গোপন থাকবে না। কয়েকখানা চিঠি জলের ওপরে ভেসে উঠলেই ধরা পড়ে আমার চাকরি যাবে। তারপরে নতুন লোক এসে নতুন উপায় উদ্ভাবন করবে চিঠি বিলির।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

সে বলল ঃ হ্যাঁ ঠাকুরমশায়, এ সমস্ত গরিবের চিঠি। এতে বড়লোকদের কোন ক্ষতি হয় না। তাদের টেলিফোন টেলিগ্রাম টেলেক্স আছে। তাতেই তাদের সব কাজ চলে যায়। আমাদের

সাহেবদেরও তাই। তাই আমার দুঃখ দেখবার কেউ নেই। গরিবের দুঃখ তো দুঃখ নয়।

এত দিন সবাইকে হরিনাম করার পরামর্শ দিয়েছি। কিন্তু কুম্ভীপাকে আমার সে সাহস হল না। তাড়াতাড়ি আমি বললামঃ সদর রাস্তাটা কত দূরে বাবা?

সে বললঃ একটুখানি এগোলেই সদর রাস্তার মোড় পাবেন।

আমি আর কথা না বলে দ্রুত পদে এগিয়ে গেলাম।

ধর্মরাজের অব্যবস্থার কথা ভাবতে ভাবতে আমি এগোচ্ছিলাম। চৌরাস্তায় পৌঁছে আমি চমকে উঠলাম একটা বিকট হুঙ্কার শুনেঃ কৌন হ্যায়?

তারপর সামনেই দেখলাম আমার প্রশ্নকর্তাকে। অসুরের মতো গোঁফ আর গালপাট্টা, হাঁটু অবধি প্যান্ট বেল্ট দিয়ে ভুঁড়ির ওপরে বাঁধা, পায়ে বুট, হাতে লাঠি ও মাথায় লাল পাগড়ি। আমি সভয়ে বললামঃ আমি ব্রহ্ম—

তার আর এক হুঙ্কারে আমি ছিটকে পিছিয়ে গেলাম। সে বললঃ শালা বর্মাসে আয়া হ্যায়! নিকালো পাসপোর্ট ঔর ভিসা।

ওরে বাব্বা, এ বলে কী! এ সব কথা তো আমি জীবনেও শুনি নি! ভয়ে ভয়ে বললামঃ এই নামাবলী ছাড়া আমার তো আর কিছু নেই বাবা!

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে আমার নামাবলী ধরে একটা হেঁচকা টান দিল। সেই টানে আমার কাপড়খানাও খুলে পড়ে যাচ্ছিল। কোন রকমে তা সামলে বললামঃ ঢেঁকি আর বীণা কোথায় পড়েছে তা এখনও জানি না।

ঢেঁকি, ইয়া ঢাকা! বর্মাসে ঢাকা হোকে আয়া হ্যায়! অউর ক্যা খো গিয়া বোলতা হ্যায়?

ভয়ে ভয়ে বললামঃ বীণা, মানে বাদ্যযন্ত্র!

আচ্ছা ! বাজামে ভরকে লাতা হ্যায় ! শালা স্মাগ্‌লার !

বলেই আমার পেটে একটা লাঠির গুঁতো মেরে বলল ঃ চল্‌ থানেমে।

ঠিক এই সময়েই একটা শব্দ শুনে এক দিকে তাকাতেই দেখি দুটি আলোর চোখ। আমার মনে হল, কোন রাক্ষস এই দিকে ধেয়ে আসছে। কিন্তু কাছে এসে থামতেই দেখলাম যে এটি একটা বিরাটকায় যান, নাম লরী। কোন গ্রামাঞ্চল থেকে বিচালি নিয়ে শহরে এসেছে। সামনের দিকে উপবিষ্ট সারথি ও তার সহকারীর সঙ্গে বাক্যালাপের পর কিছু পকেটস্থ করে সেই অসুর সদৃশ লোকটি বলল ঃ ঠিক হ্যায়, যাও।

কিছু পকেটস্থ করে…

লরী চলে যাবার পরে আমি প্রশ্ন করলাম ঃ তুমি কে বাবা ? এত খাতির কেন তোমার ?

লোকটা আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ মেরা ড্রেস দেখকে ভি মুঝে নেহি পহ্‌চানা ?

বলেই আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে নিজের গোঁফ মুচড়ে সগৌরবে বলল ঃ ময় কুম্ভীপাককা পুলিশ হুঁ।

আমি তাড়াতাড়ি তাকে একটা নমস্কার করে বললাম ঃ জয় রামজী

কি বাবা। আমি তোমাকে চিনতে পারি নি!

আমরা থানার দিকে অগ্রসর হয়েছিলাম। পুলিশ আমার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করল: তুমহারা কোন্ চীজকা কারবার?

সাহস পেয়ে আমি বললাম: হরি নামের!

উঃ কেয়া গাঞ্জা আফিমসে ভি কিম্‌তি হ্যায়! তব্ কুছ ছোড়ো না বাবা! বেকার মুঝ্‌কো কিঁউ তক্‌লিফ দেতা হ্যায়!

এইবারে আমি কিছু অনুমান করতে পেরে জিজ্ঞাসা করলাম: ওরা তোমাকে কী দিয়ে গেল পুলিশ বাবা?

পুলিশ বলল: শালা লোগ চাওল্‌কা বেপারী। ভুসাকে নিচে চাওল্‌কা বোরা লেকে যাতা হ্যায়। রোজকা কারবার। অব্ তু নিকাল্।

আমি বললাম: তাহলে একটু বোসো এইখানে।

বলে পথের ধারে বসে উলুকেশ্বর গন্ধর্বের কাছে শেখা একখানি হরিনাম গান শুরু করলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই পুলিশ তার পায়ের বুট দিয়ে আমার পেটে ক্যাঁক করে এক লাথি মেরে বলল: শালা মজাক্ করতা হ্যায়!

বলেই হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল এবং থানায় এসে স্মাগ্‌লার অভিযোগে আমাকে জমা দিয়ে তাঁর নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

দেবরাজ, কিছুক্ষণ আগে আমি ধর্মরাজের অব্যবস্থার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন তাঁর রাজ্যে শান্তি রক্ষার সুব্যবস্থা দেখে মনে মনে তাঁর প্রশংসা না করে পারলাম না। কুম্ভীপাকে পুলিশের একটি বিরাট বাহিনী শান্তিরক্ষার কাজে নিযুক্ত আছে। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে কোন কুকর্ম করবার উপায় নেই, কিন্তু তাদের খুশী করে যে কোন কর্ম করা যেতে পারে। সারাক্ষণ তারা পথঘাট পাহারা দিচ্ছে। কোন গোলমালের সম্ভাবনা আছে দেখলেই তারা দলবদ্ধভাবে ছুটে এসে কুরুক্ষেত্র বাধাচ্ছে। চোখের সামনে তারা চুরি-ডাকাতি জুয়া-মাতলামি

খুন-জখম কিছুই ঘটতে দেবে না। আগে থেকে ব্যবস্থা থাকলে তারা সময় মতো সরে থাকে পরে সেখানে এসে নিরীহ পথচারীকে ধরে ভরে দেবে থানায়। তাদের দাপটে পথচারী নির্বিঘ্নে পথ চলে, গৃহস্থ নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমোয়, কুমারী কন্যা ও কূলবধূরাও অপহৃতা হবার ভয়ে গৃহে বন্দী হয়ে থাকে না। দৈবাৎ এসব ঘটনা ঘটলে কাউকে না কাউকে ধরে এনে তার শাস্তির বিধান করে। আমার দশা দেখুন না! আমি যে কুম্ভীপাকের পুণ্যবান নই, এ কথা মুহূর্তে বুঝে নিয়েই আমাকে তারা থানায় ধরে আনল এবং পিছন দিকের একটি অন্ধকার খোঁয়াড়ের লোহার দরজা খুলে তার মধ্যে আমাকে ঠেলে দিল।

ধাক্কা খেয়ে আমি একজনের ঘাড়ে পড়ে গিয়েছিলাম, আর এক ধাক্কায় সে আমাকে অন্য ধারের দেওয়ালে ঠেলে দিয়ে বলে উঠল : শালা অন্ধা নাকি!

ভয়ে ভয়ে আমি বললাম : না বাবা, অন্ধ নই, অন্ধকারে দেখতে পাইনে।

রাতকানা?

তাও নই, আলো থাকলে রাতেও দেখতে পাই।

তবে এই অন্ধকার রাতে ব্যবসা চালাচ্ছিস কী করে রে শালা?

দেবরাজ, আপনি তো জানেন যে আমি এ পর্যন্ত কারও ভগিনীকেই বিবাহ করিনি। তবু কেন জানি না কুম্ভীপাকের এই পুণ্যবানরা দেখা হতে না হতেই আমার সঙ্গে শালা-ভগিনীপতি সম্পর্ক পাতিয়ে বসছে। এ বোধ হয় কোন সম্মানের সম্পর্ক, তাই আমি আরও মোলায়েম স্বরে বললাম : আমার কোন ব্যবসা নেই বাবা, নিতান্ত কপালের গুণেই এই আশ্রয় পেয়েছি।

সে বলল : বাদুড়ের মতো রাতে যে দেখতে পাসনা তা বুঝতে পারছি। কিন্তু পোড়া পেট চালাস কী করে রে শালা?

বললাম : গান গেয়ে ঘুরে বেড়াই, তাতেই কোন রকমে চলে যায়।

হুঁ, মিঞা তানসেন! তা আকবর বাদশাহটা কে?

এতক্ষণে আমার চোখ কিছু ধাতস্থ হল। দেখতে পেলাম যে আমার প্রশ্নকর্তা একটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে আছে। তার দু চোখ জ্বলছে বাঘের মতো, মুখে একটা হিংস্র ভাব। আমি তার দিকে ভয়ার্ত চোখে চেয়ে আছি দেখে বলল: অমন হাঁ করে দেখছিস কী?

বলে তার ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বার করে দাঁতে চেপে খচ্ করে একটা দেশলায়ের কাঠি জ্বালল। সেই আলোয় আমার নামাবলী দেখেই মুখের বিড়িটা সরিয়ে বলে উঠল: আরে রাম রাম, এ যে ঠাকুরমশায়! তা আপনার এ দশা কেন?

তারপর আমার পায়ের ধুলো নেবার মতো একটা ভঙ্গি করে বলল: নিন নিন, আপনিও ধরান একটা।

বলে তার ট্যাঁক থেকে আর একটা বিড়ি আমাকে দিয়ে দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে দিল। সেই বিড়ির ধোঁয়ায় মনে আমার পুলকের সঞ্চার হল। বললাম: হাসপাতাল থেকে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছি।

সেখানে তো ভালই ছিলেন, তা পালাতে গেলেন কেন?

বললাম: আমার পাশের খাটে দীনবন্ধু ভদ্র বিনে চিকিৎসায় মরে গেল।

মরে গেল! আহা, বড় ভাল ছিল লোকটা। লোকের ভাল ছাড়া মন্দ কোনদিন করে নি।

তুমি চেনো তাঁকে?

ধেনো জহ্লাদ চেনে না কাকে?

বলে পড় পড় করে তার বিড়িটা শেষ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল: আমার লাঠির ঘায়েই তো লোকটা মরল। কিন্তু পুণ্য হল শক্তিশেল সমাজপতির। তার সাকরেদরাই তো আমাকে কয়েক বোতল ধেনো খাইয়ে বলেছিল, ধেনো জহ্লাদ, আমরা একটা ছুঁড়িকে চুরি করব, একটু নজর রাখিস। নেশার ঘোরে দীনবন্ধু ভদ্রকে তো চিনতে পারি নি। একটা লোক ধেয়ে আসছে দেখেই মেরেছিলাম

এক লাঠি।

তারপর ?

কে যেন চিৎকার করে বলল, মরে গেল দীনবন্ধু ভদ্র। আর এই চিৎকারেই আমার নেশা ছুটে গেল। আর কারও তো সাহস হত না, আমিই তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : তা ঠাকুর মশায়, এবারে আপনি আমার সাক্ষী রইলেন।

কী রকম ?

আজ সমাজপতির এক বন্ধুকে উড়িয়ে দিয়ে এলাম।

বন্ধুকে ?

ধেনো জহ্লাদ বলল : বুঝলেন না! বুঝবেন না আপনি। এর নাম হল কূটনীতি। ওকে উড়িয়ে দিয়ে নিজের পথ পরিষ্কার করবার জন্যে বন্ধুত্ব করেছিল। কিছুদিন থেকে খুব দহরম মহরম। বন্ধুতা করেই মর শালা। সমাজপতিকে কেউ সন্দেহ করবে না। আজ ঐ শালাই ডাকবে শোকসভা।

কিন্তু তোমার কী হবে ?

আমার ?

বলে ধেনো হাসল। সন্ধ্যেবেলায় পথে মাতলামি করার জন্য এইখানে ঢুকেছি। খাতায় নাম উঠেছে। তারপরে ঘাতক গুপ্তের দয়ায় ছাড়া পেয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্যে। কাজ হাসিল করে আবার এসে ঢুকেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ঘাতক গুপ্ত কে ?

ধেনো আশ্চর্য হয়ে বলল : চেনেন না তাকে ? এই থানার হর্তাকর্তা বিধাতা। শক্তিশেল সমাজপতির বন্ধু। টাকার বন্ধুতা।

কিন্তু তুমি এ সব কাজ কর কেন ? এতে তোমার কী লাভ হয় ?

ধেনো জহ্লাদ নিজের পেটের ওপরে একটা চাঁটি মেরে বলল : এই পোড়া পেটের জন্যে। অন্য উপায় থাকলে কি এই কাজ করতাম!

সমাজপতির ভয়ে আমারও রাতে ঘুম হয় না.

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: কেন?

আমার পেছনেও তো আর এক জহ্লাদকে লাগিয়ে রেখেছে। দরকার হলে আমাকেই উড়িয়ে দেবে।

তারপরে আমাকে প্রশ্ন করল: আপনাকে কী বলে ঢুকিয়েছে?

বললাম: স্মাগ্‌লার নাম দিয়ে! সে কী বস্তু বাবা?

ধেনো জাহ্লাদ বলল: স্মাগ্‌লিং জানেন না?

না।

স্মাগ্‌লিং হল সরকারী ব্যবসা। পয়সার দরকার কার নেই বলুন! ধর্মরাজের সরকার তাই নানারকম আইন করে এই স্মাগ্‌লারদের জন্ম দিয়েছেন। কুম্ভীপাকে কোন দরকারী জিনিস নেই, জনতা হাহাকার করে মরছে তার জন্যে! অন্য নরক থেকে দাও তার আমদানি বন্ধ করে। অমনি তার চোরা চালান শুরু হয়ে যাবে, খাও সবাই লুটেপুটে। চুনোপুঁটিরা খেতে পাচ্ছে না! গ্রাম থেকে শহরে খাদ্য আনা কণ্ট্রোল কর। মানে সবাই খাও, খাওয়াও সবাইকে, একা না খেলেই কোন বিপদ নেই। বুঝলেন ঠাকুর মশায়, বড় দয়ালু আমাদের ধর্মরাজের বর্তমান সরকার।

কিছুক্ষণ থেকেই নানা বিচিত্র শব্দে আমার মন অন্য দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। গলার চাপা স্বর, প্রহার ও কাৎরানির শব্দ। সেই দিকে আমার কৌতূহল লক্ষ্য করে ধেনো জহ্লাদ বলল: ধোলাই হচ্ছে।

সে আবার কী?

পেটের কথা বার করবার জন্যে কোন ছোঁড়াকে পেটাচ্ছে। কেন ওরা চেঁচামেচি করে, তাই জানতে চায়। কিন্তু কেন ওরা চুপ করে থাকবে বলুন তো! বাপের পয়সায় লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু রোজগার করতে পারছে না বলে বাড়িতে শুধু গঞ্জনা শুনবে? কার দোষে সৎ পথে ওরা রোজগার করতে পারবে না? ধর্মরাজের সরকারে কেন ওদের ব্যবস্থা হবে না? এ কথা জানতে চাইলেই কি এই ভাবে

পিটুনি খেতে হবে !

হঠাৎ সব শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে এক জোড়া ভারি বুটের শব্দও গেল মিলিয়ে। আমি আশ্বস্ত হয়ে বললাম: বোধহয় ছেড়ে দিল ছেলেটাকে।

ছেড়ে দিল, না শেষ করে দিল !

মেরে ফেলল ছেলেটাকে !

ঐ সব কচি ছেলে কি মার সইতে পারে আমাদের মতো ?

ভয়ে ভয়ে বললাম: তাহলে কী হবে এখন ?

ধেনো জহ্লাদ নির্বিকার ভাবে বলল: কি আর হবে! রাত থাকতেই লাসটা নিয়ে গিয়ে কোন পাড়ায় ফেলে দিয়ে আসবে! তারপরে দিনের বেলায় সেই পাড়া থেকে আরও কয়েকটা ছেলেকে ধরে আনবে পেটাবার জন্যে। বলবে, ছেলেরা রাজনীতি করছে, সায়েস্তা করে ছাড়ব। কিন্তু আপনিও দেখে নেবেন ঠাকুরমশায়, বেশিদিন এই ভাবে চলবে না।

বলে ট্যাঁক থেকে আরও দুটি বিড়ি বার করে একটি আমাকে ধরিয়ে দিয়ে নিজে একটি ধরাল। পড় পড় করে খানিকটা ধোঁয়া মুখে নিয়ে বলল: ধর্মরাজের সরকার ভাবছে যে এবারে তাঁকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে, আর নিজেরাই করবে রাজ্য শাসন। কিন্তু নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি যাবে কোথায়! গণেশ একদিন ওল্টাবেই। আর তা ওল্টালে ঘাতক গুপ্তদেরও দিন ফুরোবে।

একটু থেমে বলল: কিন্তু এরা ভারি চালাক। তখন আবার উল্টো সুর গাইবে। এখন যাদের পেটাচ্ছে তাদের পায়ে তেল দিয়ে তাদের হুকুমেই পুরনো দলকে পেটাতে শুরু করবে। কিন্তু আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকব।

তারপরেই থু করে মাটিতে খানিকটা থুথু ফেলে বলল: কুম্ভীপাকের কীট নয়, কীটের দালাল এরা। ধর্মরাজের সাক্ষাৎ পেলে আমি এদের গর্দানই আগে নিতে বলতাম।

দেওয়ালে হেলান দিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে এক বালকের আর্তনাদে আমার ঘুম ভাঙল। চড়চাপড় আর কান্নার শব্দ থেকে বুঝতে পারলাম যে সে তার বিধবা মায়ের জন্যে খানিকটা আতপ চাল দোকান থেকে কিনে বাড়ি ফিরছিল, আর পুলিশ তাকেও স্মাগ্লার বলে থানায় ধরে নিয়ে এসেছে। তার কথা কেউ বিশ্বাস করল না। তবে নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে তার চালের থলেটা কেড়ে নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু বালকটি বেশি দূর না গিয়ে থানার নিকটেই কান্নাকাটি করতে লাগল।

ধেনো জহ্লাদের দিকে তাকাতেই সে বলল ঃ ঠাকুর মশায়ের কি দুঃখ হচ্ছে ?

বললাম ঃ শিশুর ওপরে অত্যাচার !

এটুকু না করলে চলবে কেন! সারারাত বড় বড় লরী পাচার হয়েছে। এদেরও তো কর্তব্য বলে কিছু একটা আছে। দু চারটে ফচকে ছোঁড়াকে আটকাতে না পারলে সারারাত কী কাজ করেছে বলবে !

তারপরেই হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দে আর সমস্ত শব্দ ঢেকে গেল। মনে হল যে ক্রুদ্ধ জনতা এইবারে থানা আক্রমণ করেছে। একজন চিৎকার করে বলল ঃ একি মগের মুল্লুক নাকি ! কুম্ভীপাকে কোন আইনকানুন নেই ! পুলিশ নেই ! বিচার নেই !

আর একজন বলল ঃ আর আমরা অন্যায় বরদাস্ত করব না। ধ্বনি দাও—সইব না, সইব না !

সঙ্গে সঙ্গে সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ঃ সইব না।

যারা অভিযুক্ত, এইবারে তাদের কণ্ঠস্বরও শোনা গেল। একজন বলল ঃ আমরা কী দরে কোন্ জিনিস কিনেছি, দয়া করে জেনে আসুন না বাবুরা !

আর একজন বলল ঃ আর কোথায় কত সেলামি দিয়েছি, তাও জেনে নিন।

এরই সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরও শোনা গেল। সে বলল ঃ

অত শত কথায় কাজ কি বাপু! কে তোমাদের মাথার দিব্বি দিয়ে মাছ কিনতে বলেছে গা! ঐ পয়সায় আঁশটে জল দিতে চেয়েছি তো খানিকটা, তাই নিয়ে গিয়ে কাঁচকলা সেদ্ধ চট্‌কে মজা করে খাও না কত্তা গিন্নীতে!

ধেনো জহ্লাদ বলল : বুঝলেন কিছু?

বললাম : না।

বাবুরা বাজার করতে এসেছিল। জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য দেখে ধরে এনেছে দোকানদারদের।

এখানে নিশ্চয়ই সুবিচার হবে!

দেখুন না বিচারটা।

এ কথা বলতে না বলতেই একটা বজ্র নির্ঘোষ শোনা গেল : এত ভিড় কেন এখানে? ভাগাও সবাইকে।

আর এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গে দুমদাম শব্দ ও আর্তনাদে চারি দিক পূর্ণ হয়ে গেল। পুলিশের লাঠির আঘাতে বাইরের জনতা যে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করল, আমি তা এখান থেকেই অনুমান করতে পারলাম।

ধেনো জহ্লাদ বলল : ঘাতক গুপ্ত আসছেন।

এসেই নিজের টেবিলে একটা মুষ্ট্যাঘাত করে বললেন : যত সব অন্যায় আবদার। সরকার বলছে, গরিবি হঠাও। আমি গরিবদের দেখব, না ঐ বেয়াড়া বাবুদের কথা শুনব! কই, কত লোক ধরা পড়েছে আজ?

বলে তাঁর বিচার শুরু করলেন। এক সময়ে আমারও ডাক পড়ল। একজন প্রহরী এসে দরজার তালা খুলে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল।

ঘাতক গুপ্তের প্রবল প্রতাপের কথা আমি জেনে গিয়েছিলাম। তাই তাঁকে নমস্কার করে গরুড় পক্ষীর মতো জোড় হস্তে দাঁড়িয়ে রইলাম। খাতার পাতা থেকে মুখ তুলে তিনি আমার আপাদমস্তক পরীক্ষা করে বললেন : ইণ্টারন্যাশনাল স্মাগ্‌লার! তা ওর কাছা খুলে দেখেছ ভাল করে?

তৎক্ষণাৎ এক প্রহরী আমার কাছা ধরে এমন আচমকা এ হেঁচকা টান দিল যে আমি লজ্জা নিবারণের চেষ্টার সময়ও পেলাম না। চোখ বন্ধ করে দারোগা আবার হুঙ্কার দিলেন : যত সব!

ততক্ষণে আমি আমার কাপড় সামলে নিয়েছি। ঘাতক গুপ্ত হুকুম দিলেন : পাঠিয়ে দাও ছোট সাহেবের কাছে।

তাঁরই নিকটে উপবিষ্ট অন্য এক ব্যক্তি খস খস করে কাগজে কিছু লিখে এক প্রহরীর হাতে দিতেই সে আমাকে থানার বাইরে টেনে নিয়ে গেল ; আর অদূরে দণ্ডায়মান একটি কালো গাড়িতে ঠেলে তুলে দিল।

তারই পাশে একটি গাছের নিচে যে বালকটি কাঁদছিল, তার গলার স্বর শুনেই আমি তাকে চিনতে পারলাম। এ সেই বালক, যার মায়ের জন্যে কেনা আতপ চাল এরা ছিনিয়ে নিয়েছে। এখনও সে কাঁদছে, মা আমার না খেয়ে মরে যাবে।

কিন্তু আমাদের গাড়ি সেখান থেকে আর এক জায়গায় এসে উপস্থিত হল। নেমে দেখলাম যে আমরা পুলিশের ছোট সাহেবের বাড়িতে এসেছি। তার সামনের দিকেই ছোট সাহেবের দপ্তর। তিনি দপ্তরে বসে আছেন। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, কিন্তু গভীর চিন্তায় মগ্ন। দরজার নিকটে যে প্রহরী ছিল, সে বলল : অব্ মৎ যাইয়ে, সাহাব কা মেজাজ ঠিক নেহি।

বাইরে থেকে আমি তাঁর গৃহিণীকে দেখতে পেলাম। তিনি ঘরে এসে বললেন : মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলেই কি ব্যবস্থা হবে ভাবছ? রেশনে আতপ চাল পাওয়া যাচ্ছে না বলে কি মা উপবাসে থাকবেন? কাল একাদশী ছিল, আজ তাঁর মুখে কিছু না দিয়ে আমরা কী করে খাই বল!

অসহায় ভাবে ছোট সাহেব তাঁর মুখ তুলতেই গৃহিণী বললেন : খোলা বাজারেই তো পাওয়া যায় শুনেছি, কাউকে বল না।

আমার চোখের সামনে দৃশ্যটা যেন বদলে গেল। মনে হল, কোন অসহায় বালক একটি গাছের নিচে বসে কাঁদছে, মা আমার মরে যাবে।

সে কান্না এখনও আমি শুনতে পাচ্ছি। কোথা থেকে আমার মনে সাহস এল জানি না। আমি ঘরে ঢুকেই বলে উঠলাম ঃ তুমি কিছু ভেবো না মা, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

পারবেন ব্যবস্থা কয়তে ?

বলে দুজনেই এক সঙ্গে আমার দিকে তাকালেন। আর ছোট সাহেব আমার হাতে একখানা ছাপা কাগজ দিয়ে বললেন ঃ এই নিন টাকা।

টাকা কি জিনিস আমি তখন জানতাম না দেবরাজ। পরে জেনেছিলাম যে টাকাই কুম্ভীপাকে সব, টাকার জোরেই কুম্ভীপাক চলছে। সেই টাকা হাতে বেরিয়ে এসে আমি প্রহরীকে বললাম ঃ চল থানায়।

তারপরে সেই কালো গাড়িতে চড়ে থানায় এসে ঘাতক গুপ্তকে বললাম ঃ ছোট সাহেবের বিধবা মায়ের জন্যে ভাল আতপ চাল চাই। এই নিন টাকা।

ঘাতক গুপ্ত দম দেওয়া পুতুলের মতো লাফিয়ে উঠেই হাঁক ডাক শুরু করলেন ঃ এই মধু, এই কৈটভ, এই হিরণ্যাক্ষ! প্রহ্লাদ সাহেবের জন্যে চাল চাই, আমার কোয়ার্টার থেকেই এক বস্তা গোবিন্দভোগ নিয়ে আয়।

আমার মনে এখন ঐরাবতের সাহস। গট গট করে সেই ক্রন্দনরত বালকের নিকটে গিয়েই হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। সেবিকা সৎপথী এসেছে···সেই বালকটিকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। আমাকে দেখেই সে চমকে উঠে বলল ঃ আপনি এখানে ?

আমিও একই সঙ্গে বললাম ঃ তুমি এখানে ?

সে বলল ঃ দেখুন না ভাইয়ের কাণ্ড, চাল না নিয়ে কিছুতেই বাড়ি ফিরবে না। বলছে, আমি যখন কোন অন্যায় করি নি—

আমি বাধা দিয়ে সেই বালকের হাত ধরে বললাম ঃ এসো আমার সঙ্গে।

বলে তাকে থানার ভিতরে নিয়ে গিয়ে বললাম : তোমার থলেটা চিনে নাও তো !

এক মুহূর্তে সে তার থলেটা খুঁজে নিয়েই ছুটে অন্তর্ধান হয়ে গেল।

সেবিকা সৎপথী দূর থেকে এই দৃশ্য দেখল। তারপরে তার কাছে গেলে বলল : আপনার কোন বিপদ হবে না তো ঠাকুরমশায় !

আমি বললাম : হরি আমাকে রক্ষা করবেন।

কয়েকজন পুলিশ ধরাধরি করে এক বস্তা চাল আমাদের কালো গাড়িতে তুলে দিয়েছিল। ঘাতক গুপ্ত আমার কাছে এসে বললেন : টাকাটা আপনি প্রহ্লাদ সাহেবকে ফেরৎ দেবেন ঠাকুরমশায় !

আমি বললাম : না না, টাকা ফেরৎ দিলে আপনার চালও ফেরৎ আসবে। ওটা আপনি রাখুন।

বলে আমরা গাড়িতে চেপে ছোট সাহেবের বাড়িতে চলে এলাম। প্রহরীরা ধরাধরি করে সেই বস্তাটা অন্দরমহলে নিয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরেই ছোট সাহেবের গৃহিণী বাইরে এসে আমাকে বললেন : এমন সুন্দর চাল আপনি কোথায় পেলেন ঠাকুরমশায় ?

সত্য কথা বলতে পারলাম না। তার বদলে বললাম : বাজারেই তো এ চাল পাওয়া যায়।

তিনি বললেন : আজ দুপুরে আপনি যদি এখানে আহার করেন তো মা খুব খুশী হবেন।

সকালে মাছের কথা শুনেছি। তাই ভয় পেয়ে বললাম : কিন্তু আমি তো নিরামিষাশী !

আমরাও নিরামিষ খাই।

কেন ?

এই দুর্মূল্যের বাজারে মাছ কিনে খাবার পয়সা আমাদের নেই।

কিন্তু প্রতিকারের ভার তো আপনাদের হাতেই।

না না, ও কথা আপনি বলবেন না। কিছু করতে গেলে এ কালের হরি ওঁকেই বধ করবেন।

বলে তিনি ফিরে গেলেন। আর আমি আমার বিচারের অপেক্ষায় রইলাম।

দেবরাজ, আমি আমার বিচারের রায় শুনে আশ্চর্য হলাম। কাগজপত্র পরীক্ষা করে ছোট সাহেব আমাকে বললেনঃ আমি খুবই দুঃখিত ঠাকুরমশায়! আপনার এই হয়রানির জন্যে পুলিশের পক্ষ পক্ষ থেকে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললামঃ সে কি বাবা, আপনার তো কোন অপরাধ নেই!

তিনি বললেনঃ অপরাধ আমারই। আমি এর প্রতিকারে অক্ষম।

দু হাত তুলে আমি এই দম্পতিকে আশীর্বাদ করলাম।

পুলিশের ছোট সাহেবের গৃহে স্নানাহ্নিক করে মধ্যাহ্ন ভোজের পরে আমি কুম্ভীপাকের পথে বেরোলাম। কী অদ্ভূত ব্যস্ত এই কুম্ভীপাক, তা নিজের চোখে না দেখলে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না দেবরাজ। অসুররা যখন আপনার রাজ্য আক্রমণ করত, তখনও আমি দেবতাদের মধ্যে এ রকমের ব্যস্ততা দেখি নি। এ এক বিচিত্র ব্যাপার। যাত্রীদের লক্ষ্য এক দিকে নয়, তারা চতুর্দিকে ছুটোছুটি করছে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। পিছন থেকে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে আমি ছিটকে পড়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সামনের একজন পথচারীর ঘাড়ে পড়ে সোজা হয়ে গেলাম। তিনি আর একজনের ঘাড়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত কেউ ছিটকে পড়লেন কিনা তা বুঝতে পারলাম না।

পিছনের যাত্রী আমাকে ডিঙিয়ে যাবার সময়ে বললেনঃ দাঁড়িয়ে ভাবছেন কী?

বললামঃ আমি তো দাঁড়িয়ে নেই। আমিও পথ চলছি বাবা!

বলেই নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। তিনি বাবা নন, তিনি মা।

একে চলা বলে!

বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কিন্তু যাঁর ঘাড়ে পড়েছিলাম, তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন: ঘোড়ার মতো ছুটছেন কেন! এ তো অফিসের সময় নয়!

বললাম: আমি তো ছুটছি না বাবা, আমি ধীরে ধীরেই চলেছি।

তিনি বিরক্ত ভাবে বললেন: একে ধীরে চলা বলে!

কাজেই আমি কী করব বুঝতে না পেরে একটা বাড়ির দেওয়ালে সেঁটে দাঁড়ালাম। ইচ্ছা ছিল যে এই ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পথ চলার কায়দা রপ্ত করে নেব।

দেখলাম, এ পথ নয় দেবরাজ, এ পথের ধারের ফুটপাথ। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে চলেছে। মনে হচ্ছে, দেরি হলে কোন বিশেষ ক্ষতি হয়ে যাবে, তার জন্যে মহিলারা কনুই-এর গুঁতো মেরে এবং পুরুষরা ধাক্কা দিয়ে পথ পরিষ্কার করে চলেছে। এরা কোন যানবাহনে উঠতে না পেরেই এই ভাবে চলেছে। এও জানতে পারলাম যে এটা অফিসের সময় নয় বলেই পথ চলা সম্ভব হচ্ছে। অফিসের সময়ে হাঁটা একেবারেই সম্ভব নয়। আর হাঁটার অভ্যাসও কুম্ভীপাকে উঠে যাচ্ছে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ কোন যানবাহনে ওঠবার জন্য যুদ্ধ। এই ভাবে যুদ্ধ করে কোন যানে ওঠবার সময়েই মসীজীবী মল্ল ছিটকে পড়ে গিয়ে এখন হাসপাতালে শুয়ে আছেন। আজও তিনি হাসপাতালে আছেন, না নার্সিং হোমে গেছেন জানি না।

কুম্ভীপাকে বড় বড় যান আছে; কিন্তু বাহন এখনও কারও দেখতে পাই নি। আপনার মতো ঐরাবত বা মেষ কারও নেই, শিবের মতো ষাঁড় বা দুর্গার মতো সিংহও নেই। অগ্নির মতো রাম ছাগলে বা গণেশের মতো নেংটি ইঁদুরে চেপে কেউ যাচ্ছেন না। শীতলার গাধা বা ষষ্ঠীর বিড়ালও নেই। হরির মতো গরুড়ে বা আমার পিতার মতো হাঁসের পিঠে চড়েও কেউ যাচ্ছেন না। কার্তিকের মতো ময়ূরের ব্যবহারও নেই। আমার মনে হয় যে এই সব পশুপক্ষী পালনের অসুবিধার জন্যই বোধহয় কুম্ভীপাকে এদের ব্যবহার নেই। কিন্তু পরে

জেনেছিলাম যে তা নয়। খাদ্যাভাবের জন্যই তাদের চিড়িয়াখানা নামক এক সরকারী প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়। তাদের বদলে কিছু ঘোড়া গরু ও দরিদ্র পুণ্যবানের যথেচ্ছ ব্যবহার। ঘোড়ার দানার দাম বেড়েছে বলে ঘোড়ার চেয়ে এখন অশ্বশক্তিরই বেশি ব্যবহার হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই অশ্বশক্তি বড় বড় যান চালনায় নিয়োজিত করা হয়েছে। একই কারণে গরুর ব্যবহারও কম। না খেতে পেয়ে গরু মৃতকল্প হলেই কুম্ভীপাকের পুণ্যবানদের জন্য তা কেটে বিক্রি করা হয়। গোমাংস উপাদেয় খাদ্য বলে গোহত্যা নিবারণের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু দরিদ্র পুণ্যবানের ব্যবহার খুবই জনপ্রিয়। ধনী পুণ্যবানরা রিক্সা নামের এক রকম দ্বিচক্রযানে প্রচুর মালপত্র নিয়ে আরোহণ করে এবং দরিদ্র পুণ্যবানরা গলদঘর্ম হয়ে সেই রিক্সা টানে। ধনী পুণ্যবানরা বড়ই দয়ালু। তাদের হাতে চাবুক থাকে না। তার ব্যবহার নেই। শুধু রিক্সার ভাড়া নিয়ে যৎপরোনাস্তি দরাদরি করে।

বাস নামে এখানে দু রকমের যান আছে—একতলা ও দোতলা। একটার পিছনে আর একটা চলেছে। যাত্রী তোলবার জন্য একটা বাস দাঁড়ালে পিছনের সমস্ত যানবাহন আটকে যাচ্ছে। এরা এক দিকে চলে না। পথের দু-দিক দিয়েই চলে। এবং কিছু দূরে দূরে চৌরাস্তায় এসে লালবাতির সামনে অনির্দিষ্টকাল দাঁড়ায়। সে এক তাজ্জব ব্যাপার। কেউ সোজা যাবে, কেউ ডান দিকে, কেউবা বাঁ দিকে। সেখানে এই যানের জটলা ছাড়াতে পুলিশরা হিমসিম খাচ্ছে সারাক্ষণ। তারই মধ্যে বাস বিগড়ে যাচ্ছে, বিগড়াচ্ছে মালবাহী লরি। কখনও একটা গরুর গাড়ি বা ঠেলাগাড়ি এদের মধ্যে ঢুকে পড়ে অবস্থা আরও ভয়াবহ করে তুলছে। দুপুরে এই সব যানবাহন ও যাত্রী চলাচল কম থাকে বলেই আমি আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম।

এবারে আমি দেখে শুনে ফাঁকা পথ ধরে ধাক্কা বাঁচিয়ে চলছি; আর দেখছি দৈত্যের মতো বড় বড় বাসগুলোকে। তাদের ভিতরে যত পুণ্যবান, বাহিরে ততোধিক নানা স্থানে নানা ভাবে ঝুলে আছে।

প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে তারা চলেছে। বাসগুলো একটুখানি চলেই আবার দাঁড়াচ্ছে, আর আমি তাদের ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছি। পথ মুক্ত পেয়ে আবার বাস আমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আবার আটকা পড়লেই আমি তাদের ডিঙিয়ে যাচ্ছি। এই প্রতিযোগিতা আমার ভারি ভাল লাগছিল। কিন্তু কুম্ভীপাকের পুণ্যবানরা বাসে উঠতে পারলে হাঁটা পছন্দ করেন না। পিছিয়ে পড়তেও তাদের আপত্তি নেই। তারা ভাবেন যে বাসে উঠতে পারলেই বোধহয় আগে পৌঁছে যাবেন। শেষ পর্যন্ত আমিই সকলের আগে একটি চতুষ্কোণ উদ্যানে পৌঁছে গেলাম।

এই উদ্যানের চারিধার ঘিরে বড় বড় বাড়ি, অসংখ্য গাড়ি ও জনস্রোত। কিন্তু আমি এ সব এড়িয়ে বাগানের মধ্যে একটি জলাশয়ের ধারে বেঞ্চিতে বসে সব দেখতে লাগলাম।

দেবরাজ, এখানে বসে ট্রাম নামের একটি বিচিত্র যানের দিকে আমার নজর পড়ল। এই যানগুলিও বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটে। পরে রেলগাড়ি নামের বিরাট যান দেখেছিলাম লোহার পথের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটতে। এর মধ্যে সহস্র যাত্রী শুয়ে বসে ঘুমিয়ে কুম্ভীপাকের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে পারে। জীবনে বীতশ্রদ্ধ যারা, তারা এর সামনে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে পারে। আবার এই রেলগাড়ি নিজেও আত্মহত্যা করতে সক্ষম। কখনও অন্য রেলগাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে, কখনও বা লাইনচ্যুত হয়ে সমস্ত যাত্রীর সঙ্গে এই রেলগাড়ি আত্মহত্যা করেছে বলে শোনা যায়। সে এক ভয়াবহ ব্যাপার। কিন্তু কবে যে কোন্ রেলগাড়ি আত্মহত্যা করবে তা কেউ আগে থেকে জানতে পারে না।

আমার মাথার উপর দিয়ে বিকট শব্দ করে একটি বিরাটকায় পাখি উড়ে গেল। বুঝতে পারলাম যে কুম্ভীপাকের এটি আকাশযান। নাম উড়োজাহাজ। এও নাকি মাঝে মাঝে মুখ থুবড়ে পড়ে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার দেবরাজ, এত রকমের যানবাহন থাকা

সত্ত্বেও কুম্ভীপাকের পুণ্যবানেরা যানবাহনের অভাবের জন্য সারাক্ষণ চেঁচামেচি করে। এখন তাই মাটির উপরে আর বেশি যান চলাচল সম্ভব নয় বলে পাতাল পথে রেলগাড়ি চালাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

আর আপনিও সতর্ক থাকবেন। শুনতে পাচ্ছি যে রৌরব ক্ষারকর্দম প্রভৃতি নরকের পুণ্যবানেরা মহাকাশ যানে চড়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাচ্ছে। আপনার স্বর্গ রাজ্যের ঠিকানা পেলে সেখানেও গিয়ে হানা দেবে। এবারের এই পত্রে আপনার ঠিকানা আমি দেব না দেবরাজ। চিঠিখানা পৌঁছল কিনা পরে আমি জেনে নেব।

হঠাৎ এক ভদ্রলোক এসে ধপাস করে আমার পাশে বসে পড়েই বললেনঃ হল না কিছু। পারলাম না। হেরে গেলাম এদের কাছে।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেনঃ আপনারও বুঝি আমার দশা ?

একবার ভাবলাম যে বলি আমার ঢেঁকি আর বীণার খোঁজ কোথায় করি বসে বসে তাই এখন ভাবছি। কিন্তু তাতে নতুন কোন বিপদ আসবার আশঙ্কায় আমি সে কথা চেপে গেলাম। বললামঃ কী হল আপনার ?

ভদ্রলোক বললেনঃ আমার নাম জনতা নন্দন, কোথাও কোন সোর্স নেই বলে সব জায়গাতেই ধাক্কা খাচ্ছি।

তা এখানে এসেছিলেন কেন ?

এসেছিলাম প্রাণের দায়ে। কিন্তু এরা কী বলল জানেন ? বলল, দরখাস্তের ওপরে পেপার-ওয়েট চাপা দিয়ে যান, নইলে উড়ে যাবে। পেপার-ওয়েট কী জানেন ?

বললামঃ না।

আমিও জানতাম না। তাই ওদেরই টেবিলে একটা কাগজ-চাপা খুঁজছিলাম। তাই দেখে আর একজন বললেন, পেপার-ওয়েট জানেন না, সরকারী অফিসে কাজ বাগাতে এসেছেন ? অফিসারের সঙ্গে দেখা

করুন গিয়ে।

তারপর ?

কী আবার করব বলুন। ভয়ে ভয়ে আমি অফিসারের ঘরে গিয়েই ঢুকলাম। তিনি নিতান্তই ভালমানুষ গোছের লোক। আমাকে বসতে দিয়ে বললেন : দিনকাল এই রকমেরই হয়েছে জানেন। ওদের হাতে কিছু না ধরালে ওরা আজকাল কোন কাজ করতে চায় না। বলে, মাইনে পাই অফিসে আসবার জন্যে, আর কাজের জন্যে আমাদের কাছে ওভার টাইম আর আপনাদের কাছে পেপার-ওয়েট, মানে সোজা কথায় ঘুষ। তারও আবার রেট বেড়ে গেছে!

কেন ?

অফিসার ভদ্রলোক সে কথাও বললেন : দুর্নীতি দমনের জন্যে ধর্মরাজ অফিসে গোয়েন্দা লাগিয়েছেন। এখন তাদেরও ভাগ দিতে হয়। তারাই বা করবে কী ? আমি বললাম, তাহলে আপনারা কিছু করুন! ভদ্রলোক আঁৎকে উঠে বললেন, আমরা! তাহলেই হয়েছে! নিজের হাতে কিছু করতে গেলে অফিসটাই উড়িয়ে দেবে।

জনতা নন্দন এইবারে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : দাস মলুকা ঠিকই বলেছেন।

কি বলেছেন ?

অফ্‌সর করে না অফ্‌সরি, অফিস করে না ওয়ার্ক।
দাস মলুকা কহ গ্যয়ে, সব কুছ করতা ক্লার্ক॥

আমি দুঃখিত ভাবে বললাম : তাহলে আপনার কাজ হল না ?

না। অফিসারের ঘর থেকে বেরিয়ে সেই ক্লার্কের কাছে আসতেই তিনি সোজা আমাকে দরজা দেখিয়ে দিলেন।

ঠিক এই সময়ে একটি আকাশভেদী ধ্বনি শুনে আমি চমকে উঠলাম। আর পাশে চেয়ে দেখলাম যে মুহূর্তের মধ্যেই জনতা নন্দন অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

এ কিসের শব্দ, কোথা থেকে এই শব্দ এল, প্রথমটায় আমি তা

বুঝতে পারি নি। তার পরেই দেখতে পেলাম যে আমারই চোখের সামনে একটি অফিসের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে এক যুবক সিংহনাদ করল, ইন্‌কিলাব! আর তারই পিছনে দাঁড়িয়ে তারই এক দল সমর্থক চিৎকার করে উঠল, জিন্দাবাদ! পর পর তিনবার সেই একই ধ্বনি হল, ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ! আর কুম্ভীপাকের আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল এই ধ্বনিতে। আমার লোল চামড়াতেও রোমাঞ্চ হল।

পরক্ষণেই দেখলাম যে সেই দপ্তরের সমস্ত কর্মী হুড়মুড় দুড়দাড় করে অফিস থেকে বেরিয়ে এল। তারপরে সবাই মিলে এক-একটি দপ্তরের সামনে গিয়ে ধ্বনি দিতে লাগল, ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ! আর দেখতে না দেখতেই চারি দিকের অফিসগুলো একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।

হঠাৎ আমি এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে চোরের মতো পালাতে দেখে চমকে উঠলাম। আর তিনিও আমাকে দেখে চমকে আত্মগোপনের চেষ্টা করলেন। তাই দেখে আমি বললাম: পালাচ্ছেন কেন?

ভদ্রলোক থমকে দাঁড়িয়ে বললেন: না না, পালাব কেন?

কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরে ভয় ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে বললাম: এইখেনে এসে বসুন না!

বসবার আগে তিনি আমার আপাদমস্তক দুবার নিরীক্ষণ করলেন। বোধহয় আমার গায়ের নামাবলী দেখে কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন: আপনি এখানে কী করছেন?

বললাম: মজা দেখছি।

ভদ্রলোক আঁৎকে উঠে বললেন: আপনি টিকটিকি নন তো?

টিকটিকি! আমাকে দেখে কি আপনার টিকটিকি গিরগিটি বলে মনে হচ্ছে?

ভদ্রলোক আমার পাশে বসে বললেন: চটছেন কেন ঠাকুরমশায়! চেহারা দেখে কি টিকটিকি চেনা যায়! তাহলে আর ভাবনা ছিল কী!

আমি বললাম: কী যা তা বলছেন? টিকটিকি আর গিরগিটিতে

ভুল করতে পারেন! তাই বলে আমাকে দেখে—

ভদ্রলোক বললেনঃ আসুন একটা পান খান। ব্যাপারটা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি।

বলে পকেট থেকে পানের কৌটা বার করে আমাকে একটি পান দিলেন, নিজে মুখে পুরলেন গোটা কয়েক। তারপরে আর একটি কৌটা থেকে জর্দা বার করে আমাকে একটুখানি দিয়ে নিজে মুখে পুরলেন বেশ খানিকটা। তারপরেই ব্যোম হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ।

পানের খানিকটা সুগন্ধ নির্যাস আমার মুখ থেকে পেটে যেতেই হিচ করে একটা হেঁচকি উঠল। ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে আমার হাত ধরে খানিকটা তফাতে নিয়ে গিয়ে মুখ থেকে অনেকখানি পিক ফেললেন এবং ইসারায় আমাকেও তাই করতে বললেন। আমিও খানিকটা পিক ফেললাম। তারপরে দুজনেই আবার নিজেদের জায়গায় ফিরে এলাম।

এইবারে ভদ্রলোক কিছু সদয় কণ্ঠে বললেনঃ চাকরি-বাকরি করেন না বলে এ সব কথার মানে বোঝেন না মনে হচ্ছে। গোয়েন্দার আদরের নাম হল টিকটিকি। পুলিশের গোয়েন্দা যারা, তাদের আমরা তত ভয় পাই নে। কিন্তু সরকার আজকাল সব অফিসে গোয়েন্দা পুষছে। আমাদের সঙ্গে যারা একই কাজ করে গোয়েন্দাগিরিও করছে, তারাই মারাত্মক।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ কথার মানেও আমি এই ভদ্রলোকের কাছে জেনে নিলাম। ইনক্লাব জিন্দাবাদ মানে হল, আমাদের আন্দোলন বেঁচে থাক। আর এই আন্দোলনের মানে হল সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। অফিসাররাও তো সরকারী চাকর! কিন্তু এই আন্দোলনের ব্যাপারে তারা আমাদের শত্রুপক্ষের লোক।

রাজপথে লোক তখন গিসগিস করছে। সহসা একজন ধ্বনি দিলঃ আমাদের দাবী মানতে হবে।

আর অন্যরা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলঃ মানতে হবে, মানতে

হবে।

আমি বললাম ঃ ওরা কারা ?

ওরা অন্য অফিসে চাকরি করে।

দেবরাজ, চাকরি কথাটার মানে বোধ হয় আপনি বোঝেন নি। চাকরি হল কোন কাজ না করে মাসে মাসে বেতন নেওয়া আর নানা রকম আন্দোলন করার ছাড়পত্র। যারা খেটে খায়, তাদের এরা বড়ই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। ধর্মরাজের সরকার একে একে যে সব জীবিকা রাষ্ট্রায়ত্ব করেছে, সেখানে এখন শুধুই আন্দোলন হয়। কৃষিকর্ম রাষ্ট্রায়ত্ব হয় নি বলেই এখনও খাদ্যশস্যের অভাব হয় নি। শুধু বণ্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ব করার জন্যই হাহাকার হচ্ছে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া যায় চোরা বাজারে এবং কালো টাকায় সবই সংগ্রহ করা সম্ভব।

হুড়মুড় করে একখানা জীপগাড়ি এসে থামল ভিড়ের মধ্যে। আর একজন সেই গাড়ি থেকে নামতেই তাঁর গলায় মালা দেওয়া হল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ উনি কে ?

ভদ্রলোক বললেন ঃ হরতাল মামা যখন এসে গেলেন, তখন এরা আমাকেই খাবে।

তাড়াতাড়ি আমি বললাম ঃ সে কি ! আপনাকে খাবে কেন ?

আরে মশায়, আমাকে নয়, আমার চাকরিটা খাবে। এখন যদি লাগাতার হরতাল হয় তো আমিই ধরা পড়ব আগে।

কেন, আপনি কি করেছেন ?

ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে চেয়ে বললেন ঃ আপনি টিকটিকির মতো কথা বলছেন ! ব্যাপারটা কী বলুন তো !

আমি বললাম ঃ আপনার নাম ধাম জিজ্ঞেস করলেও কি আপনি আমাকে টিকটিকি ভাববেন ?

ভদ্রলোক তাঁর পানের ডিবে বার করে বললেন ঃ না মশায়, এ কালে কাউকে অতটা বিশ্বাস করা নিরাপদ নয়।

বলে নিজে পান খেলেন, আমাকেও দিলেন। এবারে খানিকক্ষণ

দুজনেই কথা কইতে পারলাম না। তারপরে পিক ফেলে আসবার পরে ভদ্রলোক বললেনঃ এত দিন এই পানের জন্যেই বেঁচেছিলাম, এবারে এই পানই আমাকে খেল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললামঃ কী যা তা বলছেন! পান আপনাকে খাবে কী করে?

ভদ্রলোক রেগে বললেনঃ আপনার ভাষা জ্ঞান দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। পান কি আমাকে খাবে, না পান আমার চাকরিটা খাবে?

পান আপনার চাকরিটাই বা খাবে কী করে?

উঃ, আচ্ছা লোক মশায় আপনি! পান কি আমার চাকরিটা খাবে! না পানের জন্যে আমার চাকরিটা যাবে! অথচ দেখুন, এই একটি জিনিসে ভেজাল এখনও চলে না। পানের পাতা, একটু চুন খয়ের সুপুরি, আর মুস্কিপাতি জর্দা একটুখানি। বাস্, এতেই এই জীবনটা টিকে আছে। অথচ আর সব জিনিসে দেখুন, সর্বত্র ভেজাল। চালে তেলে ওষুধে মদে—কোথায় নেই! খেয়েছেন কি মরেছেন!

ভদ্রলোক বাজে কথা বলেন সারাক্ষণ, কিন্তু কাজের কথা কিছুতেই বলেন না। অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টা করে জানতে পারলাম যে আজকের গোলমালটা তাঁদের অফিস থেকেই ছড়িয়েছে এবং গোড়াতে এর মূলে ছিলেন তিনি। তার পরে তাঁর আর কোন হাত ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটাই চলে গিয়েছিল ইউনিয়নের হাতে। অফিসে তিনি ঘন ঘন পান খান এবং ঘন ঘন বাথরুমে যান পিক ফেলার জন্যে। তিনি অফিসের বড়বাবু। তাই ছোটবাবুরা তাঁর কষ্ট দেখে পিকদানির ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। এক মাসেও তা হয় নি বলে এই গোলমাল।

কিন্তু ব্যাপারটা এত সরল নয় দেবরাজ, এই একটা মাস দুপক্ষেরই তৎপরতার সীমা ছিল না। একটা পিকদানি বড়বাবুর জন্যে চাইলে ব্যাপারটার গুরুত্ব হবে না বলে বাবুরা সকলের জন্যেই এক একটা পিকদানি দেবার প্রস্তাব খোদ বড় সাহেবের হাতে দিয়েছিল এবং এর জন্য সময় দিয়েছিল সাত দিন। বড় সাহেব প্রস্তাবটা পড়ে ও

ইউনিয়নের মাতব্বরদের সঙ্গে আলোচনা করে বলেছিলেন যে সত্যিই এ একটা গুরুতর ব্যাপার এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোট সাহেবকে ডেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছিলেন। আর ছোট সাহেবও এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করেন নি। প্রস্তাবটা বুঝে নিয়েই প্ল্যানিং সেলের বড়বাবুকে ডেকে বলেছিলেন ওপরে পাঠাবার জন্যে একটা প্রপোজাল তৈরি করতে। কতগুলো পিকদানি চাই, তার ডিজাইন, ম্যানুফ্যাক্চারারদের কাছ থেকে স্যাম্পল, দামের কোটেশন, এস্টিমেট, বাজেট প্রভিশন ইত্যাদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি করতে হবে। পিকদানিগুলি কোথায় রাখা হবে তারও একটা নক্সা পাঠিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের মতামত আনতে হবে। এ রকম একটা গুরুতর ব্যাপারের মীমাংসা রাজধানীতে মন্ত্রীমণ্ডলীর বৈঠকেই হতে পারে এবং তার জন্যে কমপক্ষে বাহাত্তর ঘণ্টা সময় দেওয়া দরকার। কাজেই অফিসের সব কাজ বন্ধ করে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই প্রপোজাল তৈরি করতে হবে। তা না হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর না এলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন হতে পারে। ছোট সাহেব সব ডিপার্টমেন্টের বড়বাবুদের ডেকে সব কাজ বন্ধ করে প্ল্যানিং সেলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বললেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: এতেও কাজ হল না কেন?

বড়বাবু বললেন: পিকদানির ব্যবস্থা তো আমি পরের দিনই করেছিলাম। তাড়াতাড়ি অফিসে এসে সাফাইওয়ালাকে বলেছিলাম একটা ব্লিচিং পাউডারের খালি টিন আমার টেবিলের পাশে রাখতে। সেটা দেখেই কুরুক্ষেত্র বেধে গিয়েছিল। ইউনিয়নের এক ছোকরা তা দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল, এ কোন্ দালালের কাজ! দালাল মানে বোঝেন তো?

বললাম: না।

টিকটিকির মতো দালালও আছে আমাদের মধ্যে। সাহেবদের কৃপালাভের জন্যে দালালরা চেষ্টা করে বাবুদের সঙ্গে গোলমাল মেটাবার। কিন্তু ধরা পড়ে গেলে তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

এ তো বিপদের কথা।

বিপদ মানে বিপদ! ভয় পেয়ে আমিই সবচেয়ে বেশি চেঁচালাম। আর সাফাইওয়ালাকে ডেকে সেটা বিদেয় করবার সময়ে তার হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললাম, দোহাই তোর, কাউকে বলিস নে বাবা।

তারপরেই কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন: সেদিন রক্ষা পেয়েছিলাম। কিন্তু আজ আর রক্ষা পাব না। সাহেবরা বুঝতে পেরেছে যে এ আমারই কাজ, আমার জন্যেই ইউনিয়ন লড়ছে।

বড়বাবু আবার তাঁর গল্পের খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। অনেক কসরৎ করে জানতে পারলাম যে পর দিন নাকি বড় সাহেবের হাতে একটা পাল্টা দরখাস্ত পড়েছিল। তাতে অফিসে এতগুলো পিকদানি রাখার বিপক্ষে অনেক যুক্তি—স্থানাভাব, স্বচ্ছন্দে চলাফেরার অসুবিধা, নোংরামি, স্বাস্থ্যহানি প্রভৃতি। এই দরখাস্তের কথা শুনেই অ্যাক্‌শন কমিটির বৈঠক বসল। তারা বলল যে এটা দালালের কাজ। সাহেবরাই আমাদের পেছনে দালাল ভিড়িয়ে দিয়েছে।

বড় সাহেব এই দরখাস্তখানাও ছোট সাহেবের হাতে দিয়ে বললেন, প্রপোজাল পাঠাবার আগে এটিও আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। ছোট সাহেব দরখাস্তখানা পড়ে নিজে ছুটে গেলেন স্বাস্থ্য-দপ্তরে। স্বাস্থ্য অধিকারী রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স ডেকে সব দিক বিচার করে রায় দিলেন যে অফিসের মধ্যে পিকদানি রাখা নিরাপদ নয়; তবে দু-একটি পিকদানি দরজার পাশে বা বারান্দায় রাখা স্বাস্থ্য সম্মত। অর্থ দপ্তরের মতও পাওয়া গেল। তাঁরা বললেন যে গত বছর বন্যায় যে উপরি খরচ হয়েছিল, তা সামলে ওঠার আগেই এ বছরে খরার প্রশ্ন উঠে পড়েছে। কাজেই এ বছর অন্য কোন খাতে বাড়তি খরচ করার আগে সব দিক আরও ভালভাবে বিচার করে দেখতে হবে। প্রস্তাবটা অর্থ-দপ্তর সরাসরি নাকচ করে দেন নি বলে ছোট সাহেব তাদের এই মতটা লিখিয়ে এনেছেন। তবে পিকদানি প্রস্তুতকারীরা কিছু হতাশ করেছে।

তারা বলেছে যে আপাতত তৈরি কিছুই নেই, তবে অর্ডার খেলে তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে। কোটেশন অবশ্য একটা দিয়েছে। কিন্তু পাঁচজনের কাছে তা পাওয়া যায় নি বলে শেষ পর্যন্ত হয়তো টেণ্ডার ডাকার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তবু সমস্ত অফিসের সহযোগিতায় ও ছোট সাহেবের অক্লান্ত চেষ্টায় প্রপোজালটা বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হল এবং বড় সাহেব নিজে তা নিয়ে উড়োজাহাজে রাজধানী চলে গেলেন। দিন কয়েক পরে ফিরে এসে বললেন যে মন্ত্রীমণ্ডলী নিজেরা এত বড় একটা দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন না। বিষয়টা তাঁরা এক বিশেষজ্ঞ কমিটির হাতে দিয়েছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ছ মাসের মধ্যেই ফয়সালা হয়ে যাবে। তত দিন সবাইকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

আমি বললাম : তবে তো আপনার বড় সাহেব ভাল ব্যবস্থা করেই এসেছিলেন !

খুব ভাল ব্যবস্থা। কিন্তু এ কথা শুনেই অ্যাক্শন কমিটির মিটিং বসল। ঘন ঘন মিটিং হল কয়েকটা। তার পর বলল, অসম্ভব। ছ মাস সময় কিছুতেই দেওয়া যেতে পারে না। সাহেবদের সঙ্গে দরাদরি শুরু হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে এক মাস। এর মধ্যে ফয়সালা না হলে স্ট্রাইক। বলেই তারা কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে বিষয়টা পাঠিয়ে দিল। সব সরকারী অফিসের প্রতিনিধি নিয়ে এই কো-অর্ডিনেশন কমিটি। তারা রাজধানীতেও খবরটা জানিয়ে দিল যে এই ব্যাপারটা একটা অফিসের ব্যাপার বলে যেন না মনে করা হয়, সব অফিসেই এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

তারপর ?

বড়বাবু বললেন : আমাদের বড় সাহেবও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলেন না, তিনিও রাজধানীতে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। খবর আনলেন যে বিশেষজ্ঞ কমিটির মিটিং এখনও পর্যন্ত হয় নি ; কবে হবে তার ঠিক নেই ; ছ মাসের আগে কোন ফয়সালা হতেই পারে না। ও দিকে

কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিনিধিও খবর আনল যে সরকার ধাপ্পাবাজী করছে। যিনি বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান, তিনি বয়সে ও অভিজ্ঞতায় সকলের বড়, কিন্তু হৃদ্‌রোগে প্রায় শয্যাশায়ী। দুজন সদস্য খুবই তৎপর ; কিন্তু তাঁদের পরস্পরের সম্পর্ক সাপ ও নেউলের মতো ; বিরুদ্ধ মত প্রকাশের জন্যে এদের দুজনকে এই সব কমিটিতে রাখা হয়। চতুর্থ সদস্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে ; কিন্তু তিনি বিভিন্ন নরকে নানা কাজে এমন ব্যস্ত আছেন যে কবে ফিরবেন তার ঠিক নেই। কমিটির সম্পাদক একজন প্রতিপত্তিশালী সরকারী অফিসার ; তাঁর ওপরে যথাসম্ভব শীঘ্র এই কমিটির রিপোর্ট দাখিলের দায়িত্ব পড়েছে বলে সব কাজ ছেড়ে তিনি শুধু এই কাজই করছেন। সমগ্র কুম্ভীপাক থেকে সব রকম তথ্য সংগ্রহ হচ্ছে এবং তাঁর অফিসের বাবুরা কাজের চাপে উত্যক্ত হয়ে এখন অবস্থান ধর্মঘট চালাচ্ছে। কাজেই ইউনিয়নের মত হল যে চুপ করে বসে থাকলে এই বিষয়ের কোন ফয়সালা শীঘ্র হবে না।

তবে উপায় কী হবে ?

সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। কাল বড় সাহেবের সঙ্গে মিটিং হয়েছিল ইউনিয়নের। তারপরে অ্যাকশন কমিটির মিটিং-এ ঠিক হয়েছে যে কো-অর্ডিনেশন কমিটি যা বলবে তাই হবে। কো-অর্ডিনেশন কমিটি হরতাল মামার সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করেছে—

কথাটা তিনি শেষ করবার আগেই একটা বিস্ফোরণ ঘটল নিকটে। আর বড়বাবু বললেন ঃ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

যুদ্ধ !

হ্যাঁ, পুলিশ এসে গেছে। তাদের দেখতে পেয়েই ছেলেরা বোমা ছুঁড়ল।

দেবরাজ, আপনি এই বোমার শক্তি জানেন না। একটি বজ্র নিয়ে যুদ্ধের সময় আপনি কার দিকে ছুঁড়বেন তা ভেবে পান না। অথচ কুম্ভীপাকে এই রকমের বোমা এক একজনের পকেটে অনেকগুলি

করে থাকে। এর ধ্বনি আপনার বজ্রের মতোই, আর শক্তিও কম নয়। ঘাড়ে পড়লে মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু কাউকে বধ করবার জন্যে এর ব্যবহার সাধারণত হয় না, এটা ভয় দেখাবার জন্যেই নিক্ষিপ্ত হয়। পুলিশ বাহিনীকে জানিয়ে দেওয়া হল যে যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত। সাহস না থাকলে পালাও।

কিন্তু পুলিশ পালাবে না। তাদের কাছে লাঠি আছে। ইট-পাটকেল অগ্রাহ্য করে তারা লাঠি চালাবে। বোমা পড়লেই কাঁদনে

ইট-পাটকেল অগ্রাহ্য করে তারা লাঠি চালাবে।

গ্যাস ছুঁড়বে, আর পুলিশ আহত বা নিহত হলে বন্দুক নামের মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করবে। তখন আর যুদ্ধ নয়, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাবে প্রতিপক্ষ।

ভদ্রলোক হঠাৎ আমার নামাবলীটা এক ঝটকায় ছিনিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে নিজের মুখখানা ঢেকে বেঞ্চির উপরেই শুয়ে পড়লেন। আমি ভয় পেয়ে বললাম: কী হল?

নামাবলীর নিচে থেকে ভদ্রলোক ফিস ফিস করে বললেন: টিকটিকি।

চারি দিকে চাইতে হল না। এক দিকে চেয়েই আমি দুজনকে দেখতে পেলাম। একজনের পাশে দাঁড়িয়ে আর একজন ক্যামেরায় ছবি নিচ্ছিলেন। তাঁদের নজর ছিল রাজপথের দিকে। তাঁরা একটু-খানি সরে যেতেই আমি বললাম: উঠুন এবারে।

ভদ্রলোক উঠে আমার নামাবলীটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন: কী মারাত্মক ব্যাপার বলুন। এই যে ছবিটা নিল, বাড়ি পৌঁছেই দেখব যে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তারের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। আবার আসছে রে!

বলেই তিনি এক লাফে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

এবারে যিনি আমার কাছে এলেন তাঁকে আমি চিনতে পেরেছি। যে ভদ্রলোক ক্যামেরায় ছবি নিলেন, তাঁর সঙ্গেই ছিলেন ইনি। বললেন: ও ভদ্রলোক অমন করে পালিয়ে গেলেন কেন?

বললাম: আপনাদের টিকটিকি ভেবে ভয় পেয়েছেন।

ভদ্রলোক হা-হা করে হেসে বললেন: ভয়! তা ভয় পাবার কী আছে?

বললাম: উনি তো ভাবছেন, আপনাদের কৃপায় উনি গ্রেপ্তার হয়ে যাবেন।

কিন্তু কী করেছেন উনি?

বললাম: আপনার আসল পরিচয় না জেনে সব কথা বলি কী করে!

তাহলে আপনার নিজের পরিচয়ও তো দিতে হবে!

বললাম: আমার নাম ব্রহ্মপুত্র দেবর্ষি, পেশা হরিনাম গান।

আর আমার নাম সমাচার পত্রনবিস, সংবাদপত্রের জন্য খবর সংগ্রহ আমার পেশা।

যিনি আপনার সঙ্গে ছিলেন?

তিনি আমাদের ফটোগ্রাফার। যুদ্ধের ছবি নিয়েই তিনি কেটে পড়লেন। আর এক জায়গায় আরও বড় যুদ্ধ বাধবে বলে খবর পাওয়া গেছে। এখানকার খবর সংগ্রহ করে আমিও সেখানে যাব।

তখন ইট পাটকেল আর সোডার বোতল ফাটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল, তার সঙ্গে লাঠির ঠক্‌ঠকি। হঠাৎ কয়েকটা বোমা ফাটতেই পত্রনবিসবাবু তাঁর পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখের উপরে চেপে ধরে বললেন: আপনার নামাবলীটা চোখের উপরে চেপে ধরুন।

তার আগেই আমি রাজপথটা ধোঁয়ায় ঝাপসা হয়ে যেতে দেখলাম এবং একটা অদ্ভুত গন্ধ নাকে এসে লাগল। নামাবলীতে সমস্ত মুখখানা আবৃত করে আমি বললাম: এ কী হল?

কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ছে পুলিশে। কিন্তু এতে কিছু হবে না। ওদের চোখে এ সব সয়ে গেছে। আপনার আমার চোখ দিয়ে শুধু জল পড়বে।

এইবারে আরও বোমা ফাটল। মনে হল বেপরোয়া ভাবে বোমা ছুঁড়ছে জনতা। আর তাতে পুলিশও যে ঘায়েল হয়েছে তা বোঝা গেল বন্দুকের শব্দে। কিন্তু সমাচার পত্রনবিস নির্ভীক ভাবে আমাকে প্রশ্ন করলেন: আপনি এখানে কতক্ষণ থেকে বসে আছেন?

তা অনেকক্ষণ থেকে।

ব্যাপারটা কী জানেন?

সবই জানি।

বলে বড়বাবুর কাছে শোনা গল্পটা সংক্ষেপে বললাম।

ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন: এ একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর। আসুন, একটা ইচ্ছা করুন।

বলে আমাকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে নিজেও একটা ধরালেন। দেবরাজ, বিড়ির চেয়ে উপাদেয় এই সিগারেট। কতকাল আর আপনি থেলো হুঁকোয় তামাক খাবেন? কুম্ভীপাক থেকে আমদানি করুন বিড়ি সিগারেট। দেবতারাও আপনার জয় জয়কার করবে।

সিগারেটটা শেষ হবার পরে সমাচার পত্রনবিস বললেন: এইবারে উঠে পড়ুন তাড়াতাড়ি। আর একটা যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করতে হবে।

চোখের নামাবলী সরিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে লম্বা পা ফেলে অগ্রসর হলাম। ভদ্রলোক বললেন: হরতাল মামাকে দেখতে পেয়েছিলেন?

বললাম: দেখেছি; কিন্তু তাঁর পরিচয় পাই নি।

সে কি, নাম শোনেন নি হরতাল মামার? কুম্ভীপাকের মস্ত নেতা। যেখানে তিনি, সেখানেই হরতাল। মানে সব কাজ বন্ধ। যারা চাকরি করে তাদের আর কী! বাড়ি বসেই বেতন পাবেন। কিন্তু মরবে গরিব কুলি মজুর, যারা দিন আনে দিন খায়। তাদের কোন ইউনিয়ন নেই তো, পয়সাও নেই তাদের। তাই হরতাল ডাকার সময় হরতাল মামা তাদের কথা ভাবেন না।

পথ চলতে চলতেও বোমা ও গুলিগোলার শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। সমাচার পত্রনবিস বললেন: কিছু হতাহত হচ্ছে নিশ্চয়ই। সমান সমান দেখিয়ে দেব। একটু বাড়িয়ে দেখালে কোন পক্ষেরই আপত্তি হবে না। কী বলেন?

আমি কিছু না বুঝেই বললাম: তাই ঠিক।

সমাচার পত্রনবিসের সঙ্গে কিছু দূর অগ্রসর হবার পর প্রশ্ন করলাম: এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?

পত্রনবিসবাবু বললেন: মহাবিদ্যালয় এলাকায়।

সেখানে কারা যুদ্ধ করছে?

বিদ্যার্থীরা।

গুরু-শিষ্যে যুদ্ধ! কী আশ্চর্য!

পত্রনবিসবাবু বললেন: তা গুরু-শিষ্যে বলতে পারেন। শিষ্যরা তো যুদ্ধ করতে আসে নি। তারা কোন দাবীদাওয়া নিয়ে প্রতিকারের জন্যে এসেছিল। আর গুরুরা দরজায় খিল দিয়ে টেলিফোনে ডেকেছেন পুলিশ। গুরুদের পক্ষে পুলিশ যুদ্ধ করবে।

পুরাকালের কথা আমার মনে পড়ে গেল। দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে এসেছিল মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিখতে। দৈত্যেরা চায় না যে কচ এই মন্ত্র শিখে ফিরে যাক। বারে বারে তারা

কচকে হত্যা করত ; আর গুরু শুক্রাচার্য তাকে বারে বারেই বাঁচিয়ে তুলত। যেমন কচের গুরু ভক্তি, তেমনি শুক্রাচার্যের শিষ্য প্রীতি। মর্ত্যে এ রকম ঘটনা কত আছে তার ঠিক নেই। একলব্য তার মানস গুরু দ্রোণাচার্যকে তো নিজের বুড়ো আঙ্গুলটাই কেটে গুরু দক্ষিণা দিয়েছিল! আর কুম্ভীপাকে এই রকম! মনটা আমার বিষণ্ণ হয়ে গেল।

পত্রনবিসবাবু বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন আমার মনের কথা। বললেন : দুঃখ পেলেন তো! কিন্তু গুরুদেরও দোষ নেই। দু একজন শিষ্য এসেছে দেখলে তো তাঁরা দরজায় খিল দেন না। শিষ্যরা দলবদ্ধ হয়ে আসে বলেই বিপদ বাধে! আপনিই বলুন, এক সঙ্গে কয়েক শো লোক যদি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসে তো আপনি ভয় পাবেন না?

কিন্তু হাজার হলেও তো তারা শিষ্য!

কে শিষ্য আর কে নয়, তা কি তাদের গায়ে লেখা আছে!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম : সে কি, নিজের শিষ্যদের কি গুরুরা আজকাল চেনেন না! আগে তো এরকম ছিল না!

পত্রনবিসবাবু বললেন : আগের কথা আপনি এখন ভুলে যান। গুরুদের যখন দশ বিশ পঞ্চাশজন শিষ্য থাকত, তখন তাদের বলা সম্ভব হত। এখন তো হাজার লক্ষে পৌঁছেছে। এর পরে কোটিতে গিয়ে পৌঁছবে।

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম, এমনি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বললাম : এক সঙ্গে এত শিষ্যকে এঁরা পড়াতে পারেন?

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন : পড়ানোর কথা কী বলছেন! এই গুরুরা তো শিষ্যদের পড়ান না! এক সময়ে হয়তো পড়াতেন, কিন্তু সে সব দিনের কথা ভুলেই গেছেন।

তবে কী করেন তাঁরা?

পড়ানো ছাড়া আর সব কাজ করেন। নিজেদের আখের গোছাবার

জন্যে রাজনীতি করেন, দলাদলি করেন, কঠোর হাতে ছাত্র দমন করেন। কিন্তু ছাত্র ও তাদের বাপ মায়েরা যা চান, তা করেন না। অর্থাৎ ঠিক মতো পড়াশুনা, সময় মতো পরীক্ষা, তৎপর ভাবে পরীক্ষার ফলাফল বার করা—এ সব ব্যাপারে একেবারেই মনোযোগ দেন না, মানে মনোযোগ দেবার সময় পান না।

একটা চৌরাস্তায় পৌঁছে আমরা বাধা পেলাম। যে দিকে আমাদের যাবার কথা সেই দিকেই যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোন যানবাহনও আসছিল না সেই দিক থেকে। তাই দেখে পত্রনবিসবাবু বললেন : গোলমাল শুরু হয়ে গেছে।

আমি বললাম : গোলমালের শব্দ তো পাওয়া যাচ্ছে না!

ঠিক এই সময়েই চেঁচামেচির শব্দে আমরা চমকে উঠলাম। পথচারীরা ছুটোছুটি করতে লাগলেন। যাঁরা এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা এলেন পিছিয়ে। পত্রনবিসবাবু আমার হাত টেনে ধরে বললেন : এই দিকে আসুন।

বলে তিনি আমাকে অলিগলি দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চললেন। একটি উদ্যানের পিছনের দিকে এসে দেখলাম যে তারই অন্য প্রান্তে একটি বিশাল অট্টালিকার সামনের রাজপথ পুলিশ বাহিনীতে পূর্ণ; কিন্তু মুখোমুখি যুদ্ধ হচ্ছে না। পুলিশ বাহিনীর উপরে পাথর বৃষ্টি হচ্ছে অন্তরীক্ষ থেকে, আর তারা আহত হয়ে চিৎকার করছে! পত্রনবিসবাবু বললেন : ওদিকে না গিয়ে এই দিকেই একটু নিরিবিলিতে বসে ব্যাপারটা দেখা যাক।

বলে দুজনে একটা ফাঁকা বেঞ্চে বসলাম। ভদ্রলোক আমাকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজেও একটা ধরালেন। বললেন : নিজের চারধারে একটু নজর রাখবেন।

আমি বললাম : আমাদেরও আক্রমণ করবে নাকি?

না না, সে ভয় নেই। দরকারটা আমাদেরই। কাউকে যেতে দেখলেই চেপে ধরবেন। একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর পাওয়া যাবে, যেমন আপনার কাছে পেয়েছি।

কিন্তু আমি তো ঘোড়া নই!

পত্রনবিসবাবু বললেন: একেই ঘোড়ার মুখের খবর বলে। তা না হলে সত্যিই কি আর কোন ঘোড়া কথা বলে!

তারপর বেশ গৌরবের সঙ্গে বললেন: ইদানীং আমাদের বেশ সুনাম হয়েছে। আমরা নাকি দিনকে রাত ও রাতকে দিন করতে পারি।

সে কেমন করে?

জনতাকে খবর সরবরাহের কায়দায়! সকাল বেলায় খবরের কাগজ পড়ে আপনার নিজের চোখে দেখা ঘটনাও ভুল দেখেছি বলে মনে হবে। ভাববেন, যা দেখেছেন তাই মিথ্যা, আর যা পড়ছেন তাই হল সত্য। রামের দোষ আমরা শ্যামের মাথায় চাপিয়ে দিতে পারি, আর শ্যামের শাস্তি ভোগ করাতে পারি যত্নকে দিয়ে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: কী করে তা সম্ভব?

পত্রনবিসবাবু বললেন: খবর তো আমরা সংগ্রহ করি। কিন্তু যা সংগ্রহ করি তা ছাপা হয় না। সম্পাদকরা তার ওপরে মর্জি মতো কলম চালাতে পারেন। আর মালিকরা আদেশ করলে সে সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তাঁদের হুকুম মতো খবরই ছাপতে হয়। মিথ্যে খবর সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্যে শক্তিশালী লেখকদের মোটা মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে।

আমি বললাম: তা হলে তো খুব সুবিধে। আপনিও বাড়িতে বসে খবর লিখতে পারেন!

তা পারি। কিন্তু আসল খবরের বাইরে যে খবর তার দামই আজকাল বেশি। মানে বুঝলেন?

আমি বললাম: না।

পত্রনবিসবাবু বললেন: এই যে যুদ্ধ হচ্ছে, এর খবর কেউ পড়তে চায় না। কত হতাহত হল, তাতেও কারও কোন কৌতূহল নেই। তার কারণ এ সব নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু এইখানে বসে যদি কারও কাছে জানতে পারি যে কোন গুরু শিষ্যার একটু আধটু গোলমাল

টোলমাল হয়েছে, তাহলেই সম্পাদকরা আমার পিঠ ঠুকে দিয়ে বলবেন সাবাস ! আর লেখকদের হাতে খবরটা দিয়ে বলবেন, জমিয়ে একটা রগরগে গল্প লিখুন। পর দিন সকালের কাগজ এক লাখ বেশি ছাপতে হবে। বার্তা সম্পাদকের মাইনে বাড়বে একশো টাকা।

আর আপনার ?

আমার কথা কে জানতে পারছে ! আমি যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকব।

তবে আপনি ও সব খবর কেন দেবেন ?

না দিলে চাকরি থাকবে না। কর্তারা বলেন যে তাহা মিথ্যে হলেও ক্ষতি নেই ; পর দিনের কাগজে ছোট ছোট অক্ষরে ডিগবাজি খেলেই চলবে।

কথাটা বুঝতে না পেরে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। তাই দেখে তিনি বললেন ঃ বলা হবে, ভুল খবর দেবার জন্যে আমরা দুঃখিত।

পত্রনবিসবাবুর কথা মতো আমি চারি ধারে নজর রেখেছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে এক বুড়ো ভদ্রলোক আড়াল থেকে চোরের মতো উঁকি ঝুঁকি মারছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি লাফিয়ে গিয়ে তাঁকে চেপে ধরলাম। ভদ্রলোক আমার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন ঃ বাবারে গেলাম রে, কেন এ দিকে এলাম রে !

পত্রনবিসবাবু এক ধমক দিয়ে বলে উঠলেন ঃ ও কী করছেন দেবর্ষি-বাবু ! মেরে ফেলবেন নাকি বুড়ো ভদ্রলোককে !

আমি তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললাম ঃ আপনিই তো বলেছিলেন —

কী বলেছিলাম ?

আশপাশ দিয়ে কেউ গেলেই তাকে চেপে ধরতে !

আমি কি সত্যিই এমনি করে চেপে ধরতে বলেছিলাম !

বলে সযত্নে ভদ্রলোককে টেনে এনে নিজের পাশে বসিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিলেন। আমি বিমর্ষ ভাবে খানিকটা তফাতে বসলাম। বুঝতে পেরেছিলাম যে কুম্ভীপাকের ভাষা একটু গোলমেলে

ধরনের, কারও মুখের কথার সরলার্থে কোন কাজ করলে পস্তাতে হতে পারে। পত্রনবিসবাবুর কথায় যাকে চেপে ধরে আমি লজ্জা পেলাম, তাঁরই সঙ্গে তিনি এখন ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা বলছেন। পত্রনবিসবাবু বললেন: আপনি তো অধ্যাপক; এঁই সব ছেলেমেয়েদের পড়িয়েছেন বলছেন। তবে এঁদের দেখে এত ভয় পেয়েছেন কেন?

অধ্যাপক মশায় বললেন: ভয় কি আর সাধে পেয়েছি! সব সর্বনাশের মূলে হল কুম্ভীপাকের সংবাদপত্র।

এ কথা শুনেই আমি তাঁকে সমাচার পত্রনবিসের পরিচয় দিতে যাচ্ছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে চোখের ইসারায় থামিয়ে দিয়ে বললেন: কী করেছে তারা?

অধ্যাপক মশায় বললেন: কী করে নি! চুনকালি মাখিয়েছে আমার মুখে! ছেলেমেয়েদের কাছে আমি আর মুখ দেখাতে পাচ্ছি না।

সমাচার পত্রনবিস বেশ কৌশলে তাঁর পেটের খবর বার করে ফেললেন। দিন কয়েক আগে পরীক্ষার একখানা উত্তরপত্রের প্রতিচ্ছবি ছাপা হয়েছিল সংবাদপত্রে। তাতে কোন নম্বর দেওয়া হয় নি; অথচ যে ছেলের উত্তরপত্র তাকে নাকি ফেল দেখানো হয়েছে মার্কশীটে। অর্থাৎ খাতা না দেখেই পাশ-ফেলের বিচার হয়ে গেছে। কপাল গুণে ঐ ছেলেটি অন্য সব বিষয়ে খুব ভাল নম্বর পেয়েছে। তা না হলে পর দিনই এ নিয়ে একটা বিরাট আন্দোলন শুরু হয়ে যেত।

আমি কিছু বিস্মিত হয়েছি দেখে অধ্যাপক মশায় বললেন: ভাল ছেলে তো, তাই চুপ করে আছে। হয়তো ডাকে একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দেবে পুনর্বিচারের জন্যে। তখন একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

আমি বললাম: কিন্তু এ রকম হল কী করে?

অধ্যাপক মশায় চটে উঠে বললেন: আপনি কি ভাবছেন ঠোঙা তৈরির জন্যে আমি ঐ কাগজগুলো মুদির দোকানে বেচে দিয়েছি? সে ইচ্ছে থাকলে তো নম্বর দেবার পরে বেচতে পারতাম! আগের বছরের কাগজ বেচতে পারতাম!

পত্রনবিসবাবু তাঁকে শাস্ত করবার জন্যে বললেন: না, না, আমরা জানি যে আপনার বাড়ির ঝি এই কাজ করেছে।

ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন: পয়সার লোভ থাকলে কি এখন ধান্ধার অভাব! পরীক্ষার আগে চড়া দামে প্রশ্নপত্র বেচুন, পরীক্ষার সময় উত্তর লিখে দিন, বলে দিন, বই-খাতা নোট-চিরকুট থেকে টুকতে দিন, উত্তরপত্র বদলাবার সুযোগ দিন, বাইরের লোককে উত্তর লিখে দিতে দিন। আর পরীক্ষার খাতা দেখার সুযোগ পেয়ে থাকলে দালাল রাখুন দু চারটে। পাশ করা ছেলেও ফেল করেছে বলে দুহাতে রোজগার করুন দালালের হাত দিয়ে। তারা তাদের নিজেদের ফী আদায় করবে পার্টির কাছ থেকে। স্কুলের মাষ্টারদের তো আরও সুবিধে। ফেলু ছেলেদের সঙ্গে ভাল ছেলেদেরও ফেল করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের টিউটোরিয়াল হোমে। তারপর স্কুলের পরীক্ষাগুলো সবাই টপাটপ পাশ করে যাচ্ছে। তার পরেও কি আটকে থাকছে! ছোট চক্র থেকে বড় চক্র। একবার ঐ চক্রে ঢুকতে পারলে দু হাতে পয়সা লুটুন। ওজন করে এক বাণ্ডিল উত্তরপত্র বেচে আর কটা পয়সা পাবেন!

একটু থেমে মুখে খানিকটা ধোঁয়া নিয়ে বললেন: আর ছেলে-মেয়েরাও হয়েছে তেমনি। যা বলবেন তার উল্টোটি করবে। আর বেশি বলতে গেলে ঠিক এমনি করে আমার মুখের ওপর ধোঁয়া ছুঁড়ে দেবে।

বলে সমাচার পত্রনবিসের মুখের উপরে খানিকটা ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলেন।

পত্রনবিসবাবু তাঁর মুখখানা সরিয়ে নিয়ে বললেন: শুধু ধোঁয়া কেন, আরও নানা রকমের নেশা ধরেছে বলে শুনতে পাই।

অধ্যাপক মশায় খুশী হয়ে বললেন: মদ তো ছেলেমেয়েরা অনেক দিন থেকেই খাচ্ছে। এমন অনেক নেশা ধরেছে যার নাম আমার চোদ্দ পুরুষে শোনে নি।

পত্রনবিসবাবু কিন্তু নিজের কাজটি ভোলেন নি, বললেন : আজকের এই গোলমালটা কিসের জন্যে ?

অধ্যাপক মশায় একটা ভেংচি কেটে বললেন : তা জানতে গিয়ে কি নিজের প্রাণটি দেব !

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, বললাম : শিষ্যরা গুরু বধ করবে !

প্রাণে বধ তো করবে না, ঠ্যাং ভেঙে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে।

পত্রনবিসবাবু বললেন : উপাচার্য এখন কী করছেন ?

পাত্র মিত্র নিয়ে নিজের ঘরের দরজায় খিল দিয়ে বসে আছেন। আর ঢাল তলোয়ার নিয়ে পুলিশ তাঁদের পাহারা দিচ্ছে। ভেতরে কী লঙ্কা কাণ্ড হচ্ছে দেখুন না গিয়ে! সব জ্বলছে, আর মহাপুরুষদের মুণ্ডপাত হচ্ছে।

ভেতরে কী লঙ্কাকাণ্ড হচ্ছে দেখুন না গিয়ে !

আমি বললাম : কেন ?

অধ্যাপক মশায় বললেন : বলছে, এঁদের ভুলের জন্যেই দেশের আজ এই দুরবস্থা।

কিন্তু সমাচার পত্রনবিস তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন: আমি তো অন্য কথা শুনেছি। ওরা নাকি বলছে, ঐ মহাপুরুষদের সামনে রেখে কোন অনাচার হতে দেব না।

অধ্যাপক মশায় এ কথার জবাব দেবার অবকাশ পেলেন না। কয়েকজনের পদশব্দ শুনতে পেয়েই ভয়ার্ত হয়ে নিমেষে অন্তর্হিত হলেন।

জন কয়েক ছেলে কথা বলতে বলতে আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। তাদের কথা শুনে মনে হল যে পুলিশের গুলি খেয়ে ভাড়াটে গুণ্ডারা পালিয়েছে।

সমাচার পত্রনবিসের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন: কোন রাজনৈতিক দল বোধহয় ওদের কাজে লাগিয়েছে।

তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: এই জন্যেই কুম্ভীপাকে শিক্ষার মূল্য এত কমে গেছে, বিশেষ করে মাতৃভাষায় শিক্ষার মূল্য।

দেবরাজ, এই ভদ্রলোকের কাছেই আমি জানতে পারলাম যে কুম্ভীপাকে মাতৃভাষায় শিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে তাতে ভয়ানক অরাজকতা চলছে। কিন্তু এই শিক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ নয় বলেই দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনগণ বাধ্য হয়েই ছেলেমেয়েকে এই সব বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন; ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এই শিক্ষাব্যবস্থা অনেক কাল আগেই বর্জন করেছেন। তাঁদের পত্নী বা অধস্তন কর্মচারীরা যে ভাবে শেষ রাতে গিয়ে ছেলেমেয়ে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহে 'লাইনে' দাঁড়ান ও কৃচ্ছ্রসাধন করে থাকেন, তা দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই 'লাইন' কুম্ভীপাকের একটা বৈশিষ্ট্য। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব কাজের জন্য লাইন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, নার্সিং হোমে ভর্তির জন্য লাইন। শ্মশানে পোড়াতে হবে, তার জন্যেও লাইন। রেশনের দোকানে লাইন, দুধের জন্যে লাইন, যানবাহনে উঠবার জন্যে লাইন। রেলগাড়ি, খেলা, সিনেমা—সব রকম টিকিটের জন্যে লাইন। অফিসের লিফ্‌টে লাইন, মন্দিরে ঢুকতেও লাইন দিতে হচ্ছে আজকাল। আবার এই লাইনের মানে শুধু 'কিউ' নয়। এই লাইনের ওপর দিয়ে চলে

ট্রাম ও রেলগাড়ি, পুলিশ লাইনে কুচকাওয়াজ হয়, চোর-ছ্যাঁচোর পকেটমারদেরও লাইন, আর এই লাইনে দাঁড়িয়েই পুত্র-কন্যাকে স্কুলে ঢোকাতে হয়। কুম্ভীপাকের দরিদ্র ও মধ্যবিত্তরা অত দীর্ঘ কাল লাইনে দাঁড়িয়ে খোশামোদ তদ্বির ও যুদ্ধ করে পুত্র-কন্যাকে স্কুলে ঢোকাবার চেষ্টা করলে নিজেরা না খেতে পেয়ে মারা পড়বে।

পত্রনবিসবাবু হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলেন: কারা ছেলেমেয়েদের ম্লেচ্ছ স্কুলে পড়াতে পারে জানেন?

বললাম: জানি না।

তবে জেনে রাখুন। বিয়ের পর মধুযামিনী যাপন করে ফিরেই আপনাকে একটা দরখাস্ত দাখিল করে রাখতে হবে। এমন একটা নাম লিখতে হবে যে ছেলে বা মেয়ে দুজনেরই রাখা চলে। তারপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই ছুটোছুটি শুরু করুন। ছেলেমেয়েদের মুখে ভাল করে কথা ফোটবার আগেই তো তাকে স্কুলে দাখিল করা চাই। কত সাজগোজ, কত আধো আধো কথা, কত ছবির বই আর রঙের পেনসিল। গাড়ি করে বাপ মায়ে স্কুলে নিয়ে যাবে, নিয়ে আসবে। তবে তো সমাজে প্রতিষ্ঠা!

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম: তারপর?

লেখাপড়া কিন্তু বাড়িতেই শিখে যেতে হবে। তা না হলে স্কুলের মিস বলবেন, তোমার মা সারা দিন করেন কী? তাঁকে আসতে বলবে তো! কিন্তু বারে বারে স্কুলে গিয়ে মিস্-এর কথা শুনতে কি বাপ-মায়ের ভাল লাগবে? তাঁদের ক্লাব-পার্টি আছে, সিনেমা-থিয়েটার আছে। তাই আর একজন মিস্ আসবে বাড়িতে পড়াবার জন্যে। কিছু দিন পরে এই গোটা ব্যাপারটাই যখন পান্‌সে মনে হবে, তখন কোন পাহাড়ের স্কুলে পাঠিয়ে দেবে ছেলে-মেয়েকে। তাতে উভয়েরই সুবিধে।

কী সুবিধে তা জিজ্ঞাসা করবার সময় আমি পেলাম না। একজন উত্তেজিত যুবককে এই দিকে আসতে দেখে চমকে উঠলাম। কাছাকাছি

এসেই সে চেঁচিয়ে বলল ঃ কোন মেয়ে নিয়ে একটা রাস্কেলকে কি এই পথেই যেতে দেখেছেন ?

সমাচার পত্রনবিস লাফিয়ে উঠে তার কাছে গিয়ে দু একটা প্রশ্ন করলেন অত্যন্ত মৃদু স্বরে। তাঁদের কথোপকথন আমি শুনতে পেলাম না। কিন্তু যাবার সময় যুবকটি বলতে বলতে গেল ঃ জুতিয়ে ওই রাস্কেলের আগাপাশতলা···

পত্রনবিসবাবু আমার কাছে এসে বললেন ঃ বেশ মুখরোচক সংবাদ। ওর সহপাঠী প্রেমিকাকে নিয়ে ফুর্তি করতে গেছে এক তরুণ অধ্যাপক। তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সবিস্ময়ে বললাম ঃ শিষ্যার সঙ্গে প্রেম !

আপনি আছেন কোথায় দেবর্ষিবাবু ! অধ্যাপকরা আজকাল নাকি ছাত্রীদের নিয়ে নার্সিংহোমে যাচ্ছেন গর্ভপাত করাবার জন্যে। কিন্তু যাবেন না কোথাও, এখানেই একটু অপেক্ষা করুন। ব্যাপারটা আমি জেনে আসি।

বলে তিনি সেই ছাত্রের অনুসরণ করলেন।

পুলিশবাহিনীর সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ বোধহয় শেষ হয়ে গিয়েছিল। দূর থেকে গোলাগুলির শব্দ আর শোনা যাচ্ছিল না। কিন্তু মনে হল যে নিকটে আমি একটা কান্নার শব্দ পেলাম। চেয়ে দেখলাম যে অদূরে একটি যুবক দু হাতে তার মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কাছে গিয়ে আমি তার আপাদমস্তক দেখলাম। না, দেহের কোন স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে না, কোন আঘাতের চিহ্নও আমার চোখে পড়ল না। আমি তার পাশে বসে প্রশ্ন করলাম ঃ তুমি কাঁদছ কেন বাবা ?

সে আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েই নমস্কার করে বলল ঃ হেরে গেলাম ঠাকুরমশায়। মরতে এসেও পালিয়ে এলাম।

আমি সভয়ে বলে উঠলাম ঃ তুমি কি আত্মহত্যা করতে

বেরিয়েছিলে!

যুবকটি যেন হাসবার চেষ্টা করল। কিন্তু আমার চোখে তা কান্নার মতোই করুণ মনে হল। কোন রকমে সে বলল: আত্মহত্যা তো কঠিন কাজ নয় ঠাকুরমশায়, তার জন্যে কারও কোন সাহায্যের দরকার নেই।

তবে?

আমি একটা আদর্শের জন্যে মরতে চেয়েছিলাম। মরে শহীদ হতে পারতাম। কিন্তু গুণ্ডা নাম নিতে চাই নি বলেই পালিয়ে এসেছি। ভাগ্যও আমার সঙ্গে পরিহাস করল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: এই বয়সে মরতে চেয়েছিলে আদর্শের জন্যে! গোটা জীবনটাই তো তোমার পড়ে আছে বাবা! এমন কী হল তোমার!

অঙ্কের হিসেবে তাই আছে ঠাকুরমশায়। কিন্তু ভাগ্যের হিসেবে আছে একটা শূন্য!

কথাটা বুঝতে না পেরে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

সে বলল: আমার কথা শুনতে ভাল লাগবে কি?

বললাম: কেন ভাল লাগবে না?

তারপরে সে তার সংক্ষিপ্ত জীবনের কাহিনী আরও সংক্ষেপে বলল। তাদের অবস্থা খারাপ ছিল না, কয়েকটি ভাইবোন নিয়ে তাদের সুখের সংসারই ছিল। পড়াশুনোয় ভাল ছিল বলে স্কুলের পড়া শেষ করে সহজেই ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ঢুকতে পেরেছিল। কিন্তু পাশ করে বেরিয়ে আসবার আগেই তার বাবা মারা গেলেন। তার পড়া শেষ করতে পরিবারের সব সঞ্চয় শেষ হয়ে গেল। এখন সংসার অচল, কিন্তু সেই অচল চাকা সচল করবার জন্যে তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। কোথাও তার চাকরি হয় নি, হবার সম্ভাবনাও নেই। তারা এখন নিঃস্ব। সবাইকে এবারে অনাহারে মরতে হবে। অথচ সবাই আছে তারই মুখের দিকে চেয়ে। পরিবারের বড় ছেলে সে, তারই

দায়িত্ব সবাইকে রক্ষা করা।

তাহলে উপায়?

ভারাক্রান্ত স্বরে যুবক আমার প্রশ্নের উত্তর দিল: শহরে আমরা মজুর খাটতে পারি না, গ্রামে গিয়ে চাষবাস করতে শিখি নি। চেহারা দেখে মিস্ত্রীর কাজও কেউ দেয় না। লেখাপড়া শিখে আমরা এখন কী করতে পারি বলতে পারেন?

আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি। কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

সে বলল: কিছু দিন আগে এক বিদেশী নাকি কুম্ভীপাকে সমীক্ষা করে বলেছিল যে এখানে যে হারে ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ার তৈরি হচ্ছে, তাতে অচিরে বেকারের সংখ্যা বাড়বে। এখন দেখছি যে সত্যিই আমরা বেকারের সংখ্যাই বাড়িয়েছি।

আমি আস্তে আস্তে বললাম: তোমার আদর্শের কথা কী বলছিলে?

হ্যাঁ। অনেক ভেবে চিন্তে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনের একটা খসড়া তৈরি করেছিলাম। নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা। দেশে কেউ অশিক্ষিত থাকবে না। অথচ উচ্চ শিক্ষার পরে কেউ বেকারও থাকবে না। একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত সরকার বিনা মূল্যে শিক্ষা দেবেন। বাধ্যতামূলক শিক্ষা। তারপরে তারা নিজ নিজ বৃত্তির শিক্ষা পাবে, যা থাকলে তাদের জীবিকার জন্য চাকরির উপরে নির্ভর করতে হবে না। বৃত্তিমূলক উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব থাকবে নিয়োগ কর্তার ওপরে। অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষার পরে সে কী করবে এ চিন্তা তার বা তার অভিভাবকদের থাকবে না। সরকারী নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তা আগেই স্থির হয়ে থাকবে। শিক্ষার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা মুক্ত হবে। আর পরীক্ষায় পাশ করাই শিক্ষার এক মাত্র উদ্দেশ্য হবে না। ছেলেমেয়েরা যেন তেন প্রকারে একটা ডিগ্রী নেবার জন্যে পরীক্ষা দেবে না। পয়সা দিয়ে জাল ডিগ্রীও সংগ্রহ করবে না তারা।

আমি বললাম: এ তো খুব ভাল কথা।

যুবকটি বলল : এই কথা একটা কাগজে লিখে আমরা কয়েকজন শিক্ষিত বেকার গিয়েছিলাম তা উপাচার্যের হাতে দিতে।

তার জন্যে গোলমাল হল কেন ?

এরই জন্যে গোলমাল হলে তো আমি পুলিশের বন্দুকের সামনে বুক চিতিয়ে শহীদ হতে পারতাম। কিন্তু একটা গোলমাল বাধাবার জন্যে যে ভাড়াটে গুণ্ডারা তৈরি হয়ে ছিল তা জানতাম না।

কেন ?

একজন নেতার মেয়ে পরীক্ষায় ফেল হয়েছিল। নতুন উপাচার্য এর গুরুত্ব বুঝতে না পেরে পুনর্বিবেচনা করে তাকে পাশ করান নি। আজ তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্যেই ব্যবস্থা হয়েছিল।

তারপরে পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে তা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল : এবারে আমি কী করব বলবেন ?

আমি হতবুদ্ধি হয়ে বলে ফেললাম : হরিনাম কর।

ছেলেটি লাফিয়ে উঠে বলল : আমার সঙ্গে আপনি তামাশা করছেন ঠাকুরমশায় ! বাড়ি বসে হরিনাম করলেই কি আমি আমার মা ও ভাইবোনদের বাঁচাতে পারব !

কিন্তু এ ছাড়া আমি আর তাকে কী পরামর্শ দিতে পারি ! সহসা সমাচার পত্রনবিস এসে আমাকে রক্ষা করলেন, বললেন : আসুন দেবর্ষিবাবু, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

আমি যেন বেঁচে গেলাম, এই ভাবে তাঁকে অনুসরণ করে উদ্যান থেকে বেরিয়ে এলাম।

পত্রনবিসবাবু তাঁর হাতে বাঁধা ঘড়ি দেখে বললেন : সভা আরম্ভ হবার সময় হয়ে গেছে। তবে দূরে আমাদের যেতে হবে না; এই রক্ষে।

দেবরাজ, কুম্ভীপাকের পুণ্যবানরা সময় সম্বন্ধে খুবই সচেতন। আপনাদের দীর্ঘ জীবনে সময়ের কোন মূল্য নেই বলেই হয়তো আপনারা

তাদের ঘড়ির চাকর বলবেন। এখানে সবাই হাতে ঘড়ি বাঁধে, আর বারে বারে ঘড়ির দিকে তাকায়। ঘড়ি এদের ঘুম থেকে জাগায়, ঘুমোতে যায় ঘড়ি দেখে। ঘড়ি দেখে অফিসে ঢোকে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় স্কুল-কলেজের ঘড়ি বাজে। আমোদ-প্রমোদ খেলাধূলো সবই ঘড়ি দেখে। ঘড়ি বন্ধ হলে কুম্ভীপাকের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ দিন রাত্রি বোঝার জন্যে এদের চন্দ্র সূর্যের প্রয়োজন নেই। মাস বৎসর ঋতু গণনার জন্যেও গ্রহ নক্ষত্র চেনার কোন প্রয়োজন নেই। তার জন্যে ক্যালেণ্ডার ও পঞ্জিকা আছে।

একটুখানি এগিয়ে একটা সুদৃশ্য অট্টালিকার সামনে আসতেই কয়েকজন কর্মকর্তা রাজপথেই আমাদের অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। আসন গ্রহণ করবার আগে পত্রনবিসবাবু একবার সভাপতির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন : সবাই এসে গেছেন?

কর্মকর্তাদের একজন বললেন : সভার প্রধান অতিথিকে যিনি আনতে গিয়েছিলেন, তিনি ফিরে এসেছেন। তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। আর যাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে, তিনি এখনই এসে পড়বেন।

বলে তাঁরা আবার রাজপথে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আমি সমাচার পত্রনবিসের মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন : কিছু বুঝলেন না তো!

আমি বললাম : না।

ভদ্রলোক ফিসফিস করে বললেন : মঞ্চের উপরে যাঁকে দেখছেন, তিনি এই সভার সভাপতি। নাম জরদ্গব আচার্য। এক কালে ইনি অনেক বই লিখেছিলেন, এখন এঁর লেখা কেউ পড়ে না। কিন্তু লেখবার শখ আছে। নিজের এক সংস্থা থেকে বই বেরোয়। কিছু পোকায় কাটে, বাকিটা ওজন দরে ঠোঙা তৈরির জন্যে বিক্রি হয়। নিজের গাড়িতে চেপে সভায় আসেন বলে খুব জনপ্রিয় সভাপতি।

একটু থেমে বললেন : প্রধান অতিথি যে আসতে পারবেন না, তা

আমি আগেই জানতাম। তিনি কুম্ভীপাকের খুবই জনপ্রিয় লেখক, কিন্তু থাকেন রাজধানীতে। এখানকার এত প্রকাশন সংস্থার কাছ থেকে আগাম টাকা নিয়ে বসে আছেন যে তাঁর পক্ষে কোন প্রকাশ্য সভায় যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর নাম বিজ্ঞাপিত হয়েছে বলে কিছু জন-সমাগম দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু এর মধ্যে তাঁর বই পাওনাদারই বেশি। তিনি এখন বোধহয় নতুন শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

আর যাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে?

তিনি হুঁসে আছেন, না ইতিমধ্যেই বেহুঁস হয়ে গেছেন, সেইটিই জানবার কথা।

আমি সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

পত্রনবিসবাবু বললেন: হ্যাঁ, আমি সুযোগসেবী রত্নাকরের কথাই বলছি। একটা বড় সংবাদপত্রে ইনি প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে সাংবাদিকতা করছেন। এক সময়ে নাকি লিখতে পারতেন। কিন্তু লোকে সে সব কথা ভুলে গেছে। তাই নতুন উদ্যমে আসরে নেমেছেন অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে।

বলেই থেমে গেলেন। দেখতে পেলাম যে দুজন কর্মকর্তার কাঁধে ভর দিয়ে এক ব্যক্তি আসছেন। ইনিই যে সুযোগসেবী রত্নাকর তা বুঝতে অসুবিধা হল না। তাঁর পা টলছিল। কোন রকমে তাঁকে মঞ্চের উপরে তুলে সভাপতির পাশে বসানো হল। দুজনে সৌজন্য বিনিময় হল চোখে চোখে, কেউই হাত তুলতে পারলেন না। একজন অথর্ব আর একজন অপ্রকৃতিস্থ। এবারে তৎপর ভাবে দুজনকেই মাল্য দান করা হল। একটি কুমারী কন্যা সঙ্গীত পরিবেশন করল। ততক্ষণ সবাই ধৈর্য ধরে রইলেন। তার পরেই এই সভার উদ্যোক্তা একটি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানালেন যে প্রধান অতিথি এখনও এসে পৌঁছতে পারেন নি। কিন্তু বিলম্ব হচ্ছে বলে সভার কার্য আরম্ভ করা হল। শ্রীযুক্ত সুযোগসেবী রত্নাকর কুম্ভীপাক সরকারের খেতাব পেয়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর এই সম্মানে আমরা সকলেই

সম্মানিত বোধ করে এই সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছি। এবারে আমরা সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করব, আমাদের তরফ থেকে তাঁর হাতে এই যৎসামান্য উপহারটি তুলে দিতে।

বলে একটি খাম সভাপতির হাতে দিলেন। তিনি উঠে দাঁড়াবার একটুখানি চেষ্টা করে সেটা সুযোগসেবী রত্নাকরের হাতে দিলেন। তিনি বসে বসেই সেই খামটি নিয়ে পকেটস্থ করে চেয়ারে হেলান দিলেন।

উদ্যোক্তারা বললেন: এইবারে কিছু বলুন।

সুযোগসেবী রত্নাকর বললেন: হ্যাঁ, কিছু বলতে হবে। কী বলব বলুন তো?

আপনার পুরস্কার আর এই বই সম্পর্কেই কিছু বলুন। বসে বসেই বলুন।

বলে মাইকটা মুখের কাছে এগিয়ে দিলেন।

দেবরাজ, সত্যি বলছি আপনাকে, এ রকম ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা আমি এর আগে কখনও শুনি নি। হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় কৃষ্ণ যে ভাষণ দিয়েছিলেন, আমি তাই একটি স্মরণীয় ভাষণ বলে মনে করতাম। কিন্তু সে ধারণা কত ভ্রান্ত তা আমি আজ বুঝতে পারলাম। সুযোগসেবী রত্নাকর বললেন: বন্ধুগণ, এত দিন নাকি আপনারা ভাবতেন যে আমি ফুরিয়ে গেছি, আর আমার মহৎ কিছু দেবার ক্ষমতা নেই। কিছু দিন আগে আমি যখন 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' লিখি, তখন আপনারা তাকে অশ্লীল বলে গালাগালি করেছিলেন। বলেছিলেন, শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকতে চেষ্টা করছি। কিন্তু এবারে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে আমার মধ্যে কী আগুন চাপা ছিল। কিন্তু আমার একটা দুঃখ রয়ে গেল। কুম্ভীপাক সরকার আমাকে খেতাব দেবার আগে আপনারা আমার মর্ম বুঝতে পারলেন না। আর ঐ মামলাটা না করিয়ে দিলে কুম্ভীপাক সরকারও—

পিছন থেকে একজন উদ্যোক্তা তাঁকে ঠেলে দিয়ে বললেন: চেপে যান, চেপে যান।

অ্যাঁ, চেপে যাব? আচ্ছা চেপেই যাচ্ছি।

বলেই আবার ভাষণ শুরু করলেন: 'গাঁয়ের যোগী ভিখ পায় না' বলে যে কথাটা কুম্ভীপাকে প্রচলিত আছে, আপনারা সেই কথাই প্রমাণ করেছেন। আমিও প্রমাণ করে দিলাম যে 'মরে না মরে না কভু সত্য যাহা'। আত্মা! আত্মা বলে কিছু নেই। দেহই সব, দেহের সুখেই আত্মার সুখ। কিন্তু আমরা ভীরু, আমরা কাপুরুষ। তাই বেদব্যাসের মতো সত্য কথা আমরা চেপে গিয়েছি।

এর পরে তিনি বেদব্যাসকে কাপুরুষ নপুংসক বলে গালাগালি করে যুক্তি দিয়ে সেই কথা প্রমাণ করে দিলেন। তিনি বললেন যে, বেদব্যাস কাপুরুষ ছিলেন বলেই নিজের জন্ম কথা জানা থাকা সত্ত্বেও তা রেখে ঢেকে ভয়ে ভয়ে বলেছেন। তিনি কুমারী মৎস্যগন্ধার পুত্র, পরাশর মুনি ছিলেন তাঁর জন্মদাতা। কী পরিবেশে নৌকোর উপরে তাঁদের মিলন হয়েছিল তা ঢাকবার জন্য তিনি কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করেছিলেন। এমন সংক্ষেপে তাঁদের সংলাপ লিখেছিলেন যেন তা নিতান্তই অবান্তর কথা। দুই বিধবা ভ্রাতৃবধূ ও তাদের দাসীর সঙ্গে সংসর্গের কথাও তিনি চেপে গেছেন। তিনি মায়ের আদেশ বলেই দায়মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতার এত বড় একটা সুযোগ তিনি কাপুরুষ বলেই নিতে পারেন নি। তারপরে দ্রৌপদীর কথা। এই আদর্শ রমণী কী ভাবে তাঁর পঞ্চ স্বামীর মনোরঞ্জন করতেন, তার বাস্তব কাহিনী বেদব্যাসের লেখায় অনুপস্থিত। ব্রাহ্মণের গোধন রক্ষার জন্য অস্ত্র সংগ্রহে অতর্কিতে যুধিষ্ঠিরের কক্ষে ঢুকে তিনি তাঁকে দ্রৌপদীর সঙ্গে কী অবস্থায় দেখেছিলেন, তা প্রকাশ করবার সাহস বেদব্যাসের ছিল না। বেদব্যাস ভীরু ক্লীব কাপুরুষ নপুংসক ছিলেন বলেই বাস্তব জীবনের পরম সত্যকে প্রতিষ্ঠা না করে মানুষের নীতি ধর্মের নিকট নতি স্বীকার করে সৎ সাহিত্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছিলেন।

সবাই করতালি দিচ্ছেন দেখে আমিও করতালি দিলাম। সুযোগ-সেবী রত্নাকর উৎসাহ পেয়ে বললেন: এই অভাব পূরণের জন্যেই আমি

'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' লিখেছি। প্রকাশ্য রাজসভায় দুঃশাসন কেন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করেছিলেন? তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন—

পিছন থেকে এক কর্মকর্তা তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন: চেপে যান, চেপে যান।

অ্যাঁ, চেপে যাব?

এবারে নিজের কথা বলুন।

আচ্ছা।

বলে সুযোগসেবী রত্নাকর বলতে লাগলেন: আপনারা আমার লেখা অশ্লীল বলে নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু দেখুন, কুম্ভীপাক সরকার এরই জন্যে আমাকে এত বড় একটা খেতাব দিলেন। কিন্তু বুদ্ধি করে আদালতে এই মামলাটা দায়ের না করলে কি এই খেতাব পেতাম?

পিছন থেকে সেই কর্মকর্তা তাঁর জামা টেনে ধরে বললেন: করছেন কী? চেপে যান ও কথা!

সুযোগসেবী রত্নাকর তখনই বলে উঠলেন: থুড়ি, আমি বলছিলাম আপনাদের রুচির কথা। এখনও আপনারা অনেক পিছিয়ে আছেন। বাস্তব জীবনটাকে এখনও আপনারা অন্ধকারে ঢেকে রাখতে চান। কিন্তু সেই জীবনই তো সত্য। এবারে দেখবেন পূজোর সময় কী দারুণ সত্য ঘনিষ্ঠ লেখা লিখি! কিন্তু না, এখনও কোন উঠ্‌তি লেখক তার লেখা আমাকে পড়তে দিতে আসে নি। তাদের কোন লেখা আত্মসাৎ করবার সুযোগ—

পিছন থেকে সেই কর্মকর্তা বলে উঠলেন: কী বলছেন এ সব! বসে পড়ুন এবারে।

সুযোগসেবী রত্নাকর বললেন: থুড়ি, নিজের লেখা বলে নয়, মানে আমার পরিবর্তে—তা যখন আমাকে বসতেই বলছেন আর চেকটাও দিয়ে দিয়েছেন তখন আর আমার, থুড়ি, আপনাদের সময় নষ্ট করার প্রয়োজন দেখি না। জয় হোক!

বলে তিনি দু হাত বাড়িয়ে দিতেই কর্মকর্তাদের দুজন তাঁর

প্রসারিত দু বাহু ধরে মঞ্চ থেকে নামিয়ে বাহিরে নিয়ে চললেন এবং শ্রোতারাও সভা ত্যাগ করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

কর্মকর্তাদের আর একজন সভাপতিকে বললেন : এই বারে আপনি কিছু বলুন।

কিন্তু তিনি অপ্রসন্ন মুখে বললেন : সবাই তো চলে যাচ্ছে!

তাহলে সমাপ্তি সঙ্গীতটাই হোক।

বলতে না বলতেই গান শুরু হয়ে গেল। আর সেই কর্মকর্তা তৎপর ভাবে সমাচার পত্রনবিসের নিকটে এসে বললেন : সুযোগসেবী-বাবুর ভাষণটি বেশ ভাল জায়গায় ছাপবেন। আর আপনাকে বলব কী! সবই তো জানেন, বোঝেনও সবই। প্রথম সংস্করণটা পোকায় কেটেছিল বলে অনেক ক্ষতি হয়েছিল, নতুন সংস্করণটা যাতে চলে তার জন্যেই এই চেষ্টা। মানে বুঝতেই পারছেন, মামলার খরচও তো তুলতে হবে! গালাগালিটা একটু বেশি দেবেন।

কিন্তু সমাচার পত্রনবিস গম্ভীর ভাবে বললেন : আমাদের মালিকরা কি তা মানবেন! অন্য প্রতিষ্ঠানের ডাকসাইটে সাংবাদিক লেখক, তাঁর সম্বন্ধে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু ছাপতে চাইবেন না। আমার অবস্থাটাও আশা করি বুঝতেই পারছেন!

তবু যতটা সম্ভব!

বলে তিনি সভাপতির দিকে ছুটলেন।

আবার আমরা রাজপথে এসে নামলাম। পথ চলতে চলতে সমাচার পত্রনবিস বললেন : বুঝলেন কিছু?

বললাম : অনেক কিছুই বুঝলাম না।

তা বুঝেছি! 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' নামে বইখানা অশ্লীল বলে চালাবার জন্যে প্রকাশক নিজেই মামলা দায়ের করেছিলেন। কিন্তু তার ফল পেলেন লেখক। সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে নাম বেরোতেই রাজধানীর সুযোগ্য সচিবরা তাঁকে খেতাব দেবার উপযুক্ত ব্যক্তি বলে

বিবেচনা করলেন। সংবাদপত্রের শুধু শিরোনামাই সবাই পড়ে থাকেন বলে তাঁদেরও দোষ দেওয়া চলে না। আর সমস্ত সংবাদটা পড়বার সময় তাঁদের কোথায় ?

তারপর বললেন: কুম্ভীপাকের সাহিত্য পুরস্কারও তো এই ভাবেই দেওয়া হয়। কমিটিতে যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি থাকেন তাঁদের অনেক রকমের কাজ, বই পড়বার সময় কোথায় ? আর অভ্যাসই বা কার আছে ? তাই কারও নাতনি একটা বই-এর নাম করল, বা কারও ছাত্রী, কিংবা কোন রাজনৈতিক দলের পাণ্ডা এসে দেশের লোকের নামে নিজের মতামতটাই জানিয়ে গেল, অথবা লেখকেরই কোন দালাল এসে সব সদস্যকেই এক কথা শুনিয়ে গেল। ব্যাস, আর বই পড়বার দরকার কী ? খানিকক্ষণ আলোচনা হল, তার পরে এক মত। কমিটিতে প্রকাশন সংস্থা বা সংবাদপত্রের কোন মুরুব্বি থাকলে তো কথাই নেই।

আমি বললাম: ভারি সুবিধা তো !

কিন্তু পত্রনবিসবাবু হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন: আপনিও লেখক নন তো দেবর্ষিবাবু ?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: বলেন কি !

সমাচার পত্রনবিস বললেন: নামাবলীধারীরাও তো আজকাল ধর্মকর্ম ছেড়ে বই-এর ব্যবসায় নেমেছেন। খুব চাহিদা তাঁদের বই-এর।

বলে তিনি একটু ভিন্ন পথে এগিয়ে বললেন: আসুন এই দিকে, আপনাকে একটা লিটেরারি ওয়ার্কশপ দেখাই। স্বচক্ষে দেখলেই এ ব্যবসাটা বুঝতে পারবেন।

আকাশে তখন দিনের আলো সামান্যই ছিল। সেই দিকে চেয়ে সমাচার পত্রনবিস বললেন: একটু পা চালিয়ে চলুন। অন্ধকার নামলে আর কিছু দেখতে পাবেন না।

কেন ?

কুম্ভীপাকে এখন বিদ্যুতের নিদারুণ ঘাটতি। শোনা যাচ্ছে যে

এই খাতের সব টাকা স্ফূর্তির খাতে ব্যয় হয়ে গেছে, তার দোষটা এখন কর্মীদের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। অন্তর্ঘাত! ইউনিয়ন! তবে রক্ষে এই যে লেখকদের ইউনিয়ন নেই, আছে দল, দলাদলি। শক্ত ব্যূহ রচনা করে পুরনো অভিমন্যুদের বধ করে বাইরে ফেলে দিয়েছে। নতুন কাউকেও ঢুকতে দিচ্ছে না। দলে ভিড়তে হলে দলাদলি করতেই হবে। নইলে পালাও, নিজের পায়ে দাঁড়াও। মানে নিজের খরচে বই ছেপে বিলোও। কেউ তোমার বই ছাপবে না, কেউ কিনেও পড়বে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এই সব দলের মালিক কে?

আমাদের মালিকরাই তো দলের মালিক। তাঁরাই আজকাল সাহিত্যের হোলসেল ব্যাপারী। পাইকারি হারে তাঁরা লেখক গড়ছেন। তাঁদের ছাড়পত্র না পেলে লেখা ছেড়ে হালচাষ করুন।

আমরা পা চালিয়ে চলছিলাম। পত্রনবিসবাবু হঠাৎ আমার হাত টেনে ধরলেন। আমি চেয়ে দেখলাম যে সামনেই একটা বাড়ি থেকে বেরোলেন দুজন ভদ্রলোক। রাস্তায় যে ঝকঝকে বিদেশী গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল, সেই গাড়িতে চেপে দুজনেই চলে গেলেন। পত্রনবিসবাবু আবার পথ চলতে শুরু করে বললেন: কথাটা তাহলে মিথ্যে নয়।

আমি বললাম: কী কথা?

লোকরঞ্জন সমঝদারের সঙ্গে ক্ষারকর্দমের চক্রীদের একটা যোগাযোগ আছে।

কিছুই বুঝতে না পেরে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পত্রনবিসবাবু বললেন: যে দুজনকে দেখলেন তাঁদের একজন কুম্ভীপাকের জনপ্রিয় লেখক লোকরঞ্জন সমঝদার, অন্যজন ক্ষারকর্দম নরকের চক্রী অফিসের কর্মী। গাড়িটাও ক্ষারকর্দমে তৈরি। কুম্ভীপাকে এত বড় গাড়ি তৈরি হয় না। কিছু দিন আগে ইনি যখন ক্ষারকর্দম ভ্রমণে যান, তখনই লোকে সন্দেহ করেছিল। এখন দেখছি যে সন্দেহটা অমূলক নয়।

কিন্তু তাতে ক্ষতি হয়েছে কী ?

ক্ষতির কথা বুঝতে হলে বর্তমান রাজনীতি আপনাকে আগে বুঝতে হবে। দুটি রাজনৈতিক মত এখন সমস্ত নরকগুলি গ্রাস করতে চাইছে। ক্ষারকর্দম বলছে, নরক হল ধনীর, নরকে চিরকাল ধনীর শাসনই চলবে। কিন্তু তারা দেখতে পাচ্ছে যে একটা ভিন্ন মত ধীরে ধীরে অনেকগুলি নরক অধিকার করেছে। তারা বলছে, নরক জনগণের, জনগণই তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু আমাদের কুম্ভীপাক এখনও দ্বিধাগ্রস্ত, কোন্ পথে পা বাড়াবে তা এখনও ঠিক করতে পারে নি।

ভদ্রলোক আমার হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন : ব্যাপারটা বোধহয় আপনার কাছে এখনও পরিষ্কার হয়নি ?

আমি বললাম : না।

জানি তা হবে না। এরা চাইছে যে কুম্ভীপাক তাদের পথ ধরুক। ক্ষারকর্দম নানা উন্নতির জন্যে টাকা ঢালছে কুম্ভীপাকে। এখানকার জনগণ জীবনকে আকণ্ঠ উপভোগ করতে শিখুক। তার জন্যে সব রকমের ভোগের উপকরণ পাঠাচ্ছে কুম্ভীপাকে। সস্তায় অসংখ্য বই আসছে, আর সেই সব বই-এ বাস্তব জীবনের রগরগে চিত্র। ধনীরা সেই বই দু হাতে কিনে পড়ছে। কিন্তু কুম্ভীপাকের মধ্যবিত্ত জাতটা মাতৃভাষার জন্যে মরে। তাই ক্ষারকর্দমের প্রচার পুস্তিকা তাদের হাতে পৌঁছচ্ছে না বলে লোকরঞ্জন সমঝদারের মতো জনপ্রিয় লেখকদের হাত করা দরকার। বুঝতে পারছি যে লোকরঞ্জন সমঝদার এইবারে তাঁদের জন্য কলম চালাবেন।

এই লেখকের বাড়ির সামনে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম। সমাচার পত্রনবিস আমাকে আড়ালে একটা জানালার ধারে টেনে এনে বললেন : এইবারে দেখুন একটা লিটেরারি ওয়ার্কশপ !

খোলা জানালা দিয়ে ভিতরের দৃশ্য আমি স্পষ্ট ভাবেই দেখতে পেলাম। মোটা সোটা এক মহিলা গভীর মনোযোগ সহকারে কিছু লিখছিলেন, তাঁর সামনে খানকয়েক বই খোলা। মনে হচ্ছিল, তিনি

সেই সব বই থেকে কিছু টুকছিলেন। ঘরের এক কোণে একটি ছিপ-ছিপে চেহারার মেয়ে একটা বেতের চেয়ারে বসে এক মনে কিছু লিখে যাচ্ছে, তার বাম হাতে একখানি বিদেশী পেপার ব্যাক বই। মেয়েটির পরনে খাটো স্কার্ট ও হাতকাটা ব্লাউস, কিন্তু বয়সে বালিকা নয়। অন্য

এইবার দেখুন একটা লিটেরারি ওয়ার্কশপ !

ধারে চুস্ত পাজামার মতো প্যান্ট পরা এক ছোকরা পা দোলাচ্ছে আর সিগারেট খাচ্ছে। মাঝে মাঝে স্থির হয়ে খসখস করে কিছু লিখেও ফেলছে। ঘরে একখানা চৌকিও আছে। তাব উপরে বসে এক বালিকা একখানা খবরের কাগজের কিছু কিছু অংশ কাঁচি দিয়ে সযত্নে কেটে সাদা কাগজে আঠা দিয়ে সাঁটছে। আর মেঝেয় বসে একটি শিশু রঙের বাক্স খুলে বিচিত্র রঙ মাখিয়ে কাগজ নষ্ট করছে। কিন্তু আশ্চর্যেব ব্যাপার এই যে কারও মুখে একটি কথা নেই। সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত। শুধু মাথার উপবে একখানা বড় পাখার শব্দ শোনা যাচ্ছে অল্প অল্প।

সমাচার পত্রনবিস হঠাৎ আমার হাত ধরে খানিকটা তফাতে টেনে আনলেন। আমি দেখতে পেলাম যে এক ভদ্রলোক কাঁধ থেকে একটি

থলে ঝুলিয়ে হন্ত দন্ত হয়ে সেই বাড়ির দরজায় এসেই একটি বোতাম টিপলেন। ঘরের ভিতরে টুং টাং করে শব্দ হতেই সেই মহিলা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

আগন্তুক একটা নমস্কার করে বললেন: লোকরঞ্জনবাবু বাড়ি আছেন?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মহিলা বললেন: কী দরকার আপনার?

ভদ্রলোক তাঁর দুহাত কচলে বললেন: একটা উপন্যাসের দরকার।

পাঁচ হাজার টাকা রেখে যান।

পাঁচ হাজার!

বলে ভদ্রলোক দুপা পিছিয়ে গিয়ে বললেন: সেদিন তো উনি তিন হাজার বলেছিলেন।

দুদিন পরে এলে আরও দু হাজার বেশি লাগবে।

বলে ভদ্রমহিলা দড়াম করে তাঁর মুখের উপরেই দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ভদ্রলোক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর পিছন ফিরেই আমাদের দেখতে পেলেন। সমাচার পত্রনবিসকে বোধহয় তিনি চেনেন। বললেন: কাণ্ডটা দেখলেন?

পত্রনবিসবাবু বললেন: সবই তো জানেন, তবু আসেন কেন?

ভদ্রলোক কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললেন: গত বছর পূজোর পরেই যাঁকে বায়না দিয়েছিলাম, শেষ মুহূর্তে তিনি বলছেন যে স্বনামে লিখতে পারবেন না, লেখা দেবেন বেনামে। তিনি না হয় বেশি টাকা নিয়ে চুক্তি করেছেন একটার বেশি উপন্যাস লিখবেন না; কিন্তু আমার তো একজন নামী লেখক চাই!

তবে সেই নামের জন্যে বেশি টাকা দিতে আপত্তি কেন?

দেখি আর কোথাও গিয়ে।

বলে তিনি যেমন এসেছিলেন, তেমনি করেই ছুটে চলে গেলেন।

ফেরার পথে পত্রনবিসবাবু বললেন: বুদ্ধিমান লেখকেরা এই জন্যেই

আগে ভাগে দু চারটে ছদ্মনাম নিয়ে বসে আছেন। আর এতগুলো নামে লেখবার জন্যে এই রকমের লিটেরারি ওয়ার্কশপ খুলেছেন। কিন্তু গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে বাইরের কোন লোক রাখেন নি, কুটীর শিল্পের মতো পরিবারের সবাই মিলে কাজ করছেন।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললাম ঃ ঐ সব বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও লিখছে!

লিখবে না! লিখবে না কেন! কিছু লিখলেই যদি পয়সা পাওয়া যায় তো আপনিও কি লিখবেন না?

বলে আমাকে সব বুঝিয়ে বললেন। ওই মহিলা লোকরঞ্জন সমঝদারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথম পক্ষের স্ত্রী আজকাল অন্যের ঘর করছেন এবং লিখছেন স্বনামে। কিন্তু ইনি তেমন ইমাজিনেটিভ নন বলে লেখকের পুরানো অচল বই থেকে জোড়াতালি দিয়ে নতুন উপন্যাস খাড়া করছেন। বড় মেয়েটি বিদেশী গল্প নিজের ভাষায় আত্মসাৎ করছে, আর ছেলেটি লিখছে মারাত্মক লেখা। ম্লেচ্ছ পাড়ার পানের দোকান থেকে পর্ণগ্রাফির বিদেশী বই লুকিয়ে কিনে এনে কুম্ভীপাকের বর্তমান সমাজের কথা বলে চালিয়ে দিচ্ছে।

আমি বললাম ঃ ঐ বালিকা আর শিশুও লিখছে নাকি?

পত্রনবিসবাবু বললেন ঃ তারাই বা বসে থাকবে কেন! ছোট মেয়েটি আধুনিক গল্প কবিতা লেখে। আর শিশুটি আঁকে ছবি। এ সবও লেখকের নানা নামে বেরোয়।

ঐটুকু মেয়ে গল্প কবিতা লিখতে পারে?

ওরাই তো আধুনিক সাহিত্য বাঁচিয়ে রেখেছে। এলোমেলো ভাব। এলোমেলো ভাষা! কোথায় শুরু আর শেষ কোথায়, তা না বোঝা গেলেই তো আধুনিক সাহিত্য। ঐ ভাবে খবরের কাগজের টুকরো জুড়লেই তো আধুনিক গল্প হবে।

আর কবিতা?

আধুনিক কবিতা লেখা আমি এক কবির কাছেই শিখেছিলাম। একখানা কাগজে যা মনে আসে তাই লিখুন গোটা গোটা অক্ষরে,

তারপরে সেই কাগজখানা ওপর থেকে নিচ অবধি এমন করে ছিঁড়ুন যে, কোন কথা যেন মাঝখানে ছিঁড়ে না যায়। আর চাই কী! এক সঙ্গে দুটো কবিতা হয়ে গেল!

দেবরাজ, কেন জানি না আমার মনে হল যে সমাচার পত্রনবিস একজন হতাশ লেখক। অর্থাৎ লেখক হবার চেষ্টায় কৃতকার্য হতে পারেন নি বলেই সমালোচক হয়েছেন। তাই জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি নিজে কিছু লেখেন না?

ভদ্রলোক মিথ্যা কথা বললেন না, যা বললেন তাতে আমার মন বিষণ্ন হয়ে গেল। তিনি বললেন: সত্যিই আমার লেখক হবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কুম্ভীপাকে লেখক হবার সুযোগ নেই।

কেন?

সব কিছুই এর প্রতিকূল। শুধু লিখে আপনার গ্রাসাচ্ছাদন হবে না। জীবিকার জন্য আপনাকে দাসত্ব করতেই হবে। এক সময়ে কুম্ভীপাকের লোকে তাই করত। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। কলকারখানার মতো সাহিত্যও একটা ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। দুদিন পরে কুম্ভীপাকে এটা একটা মনোপলি বিজনেস হবে। মালিক যা বলবে, তাই লিখতে হবে লেখককে। দাসত্ব যদি করতেই হয় তো সাহিত্য নিয়ে নিজের বিবেকটা নষ্ট করি কেন? এই বেশ আছি।

চলতে চলতেই ভদ্রলোক বললেন: শখ ছিল, কিন্তু তা পূরণের কোন আশা নেই বলেই এত কথা আপনাকে বললাম। আপনার ভাল না লাগলেও আমার মন খানিকটা হাল্কা হল।

এই বারে আমি যোগী মহারাজের দর্শন পেলাম। এক জায়গায় যানবাহনের জটলা দেখে সমাচার পত্রনবিস বললেন: যোগী মহারাজ তাহলে ক্ষারকর্দম থেকে কুম্ভীপাকে এসে পৌঁছে গেছেন!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: যোগী মহারাজ!

তিনি উত্তর দিলেন: মস্ত বড় যোগী, দেশে বিদেশে তাঁর নাম।

দীক্ষা দিয়ে যোগব্যায়াম শেখান মেয়েদের। বলেন, মেয়েরা উপযুক্ত হলে একটা জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে। যোগব্যায়াম দ্বারাই নিজে সিদ্ধপুরুষ হয়েছেন। তাঁর মুখের কথা কখনও মিথ্যা হয় না।

আমি বললাম ঃ তাঁর দর্শন পাওয়া যায় না ?

তাহলে ঢুকে পড়ুন না ভেতরে !

আর আপনি !

আমি এই পাড়াতেই থাকি। চট্ করে আজকের রিপোর্টটা লিখে অফিসে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। কিছু ভাববেন না আপনি।

তবু আমি ইতস্তত করছি দেখে বললেন ঃ এই পথেই আমি অফিসে যাব তো ! যাবার সময় না হয় একবার দেখে যাব।

বলে তিনি আর দাঁড়ালেন না। আর আমি কয়েকজন ভক্তের অনুসরণ করে ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

যোগী মহারাজের আশ্রম দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম, দেবরাজ। নিজের চোখে না দেখলে এ রকম আশ্রমের কথা কল্পনা করা যায় না। মর্ত্যে আমি অনেক মুনি ঋষির আশ্রম দেখেছি। ঘন অরণ্যের মধ্যে একটি পর্ণ কুটির। চারি দিকে কয়েকটি ফল ও ফুলের গাছ। দু একটি হরিণ শিশু। আর অদূরে একটি স্রোতস্বিনী। মহামুনি বশিষ্ঠ এই রকম একটি আশ্রমেই তাঁর নন্দিনী নামের কামধেনু নিয়ে বাস করতেন। মহারাজা বিশ্বামিত্র এইখানে এসেই যুদ্ধ করেছিলেন বশিষ্ঠের সঙ্গে। এই শত্রুতায় তাঁর যে সাধুসঙ্গের পুণ্য হয়েছিল, তা আমরা বাসুকীর কৃপায় জানতে পেরেছি। পৃথিবীর ভার মাথায় নিয়ে বিশ্বামিত্র যখন তলিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর সমস্ত তপস্যার ফল অর্পণ করার পরেও পৃথিবী যখন স্থির হচ্ছিল না, তখন বশিষ্ঠের সঙ্গলাভের পুণ্যফল অর্পণ করতেই পৃথিবী স্থির হয়েছিল।

কিন্তু দেবরাজ, এ সে রকমের কোন আশ্রম নয়। এ আশ্রম আপনার অমরাবতীর প্রাসাদের মতো মনোরম। তাই দেখে আমার মনে হল যে আমি এই যোগী মহারাজের সঙ্গলাভে আরও বেশি পুণ্য

সঞ্চয় করতে পারব।

একটি বিরাট ও প্রশস্ত কক্ষের এক প্রান্তে যোগী মহারাজের সিংহাসন্। মখমলের মসনদের উপরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন রক্তাম্বর পরিহিত যোগী মহারাজ। শিষ্যারা পিছনে দাঁড়িয়ে চামর ও তালপাতা ব্যজন করছেন। পরে শুনেছিলাম যে শীততাপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রটি বিকল হয়েছিল বলে তাঁর মেজাজ একটু রুক্ষ হয়েছিল। তিনি রূপার গড়গড়ায় তামাক সেবন করছিলেন। কিন্তু নলটি ছিল এক শিষ্যার হাতে। শিষ্যা সেই নল তাঁর মুখে ধরেছিলেন এবং তা সরিয়ে নিতেই অন্য এক শিষ্যা তাঁর শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিচ্ছিলেন। নগ্ন গাত্রে এক বিরাটদেহী ভক্ত তাঁব পা টিপছিলেন এবং অন্য ভক্তরা তাঁর পায়ের নিচের গালিচায় বসে ভজন গাইছিল। কী প্রশান্ত গম্ভীর পরিবেশ, দেবরাজ। মনে হল যে মহাপুরুষদের আশ্রম এই রকমই হওয়া দরকার। দূরে দাঁড়িয়ে আমি যোগী মহারাজকেই দেখতে লাগলাম।

সহসা বাহিরে রাজপথের উপরে কয়েকখানা মোটর গাড়ি এসে দাঁড়াবার শব্দ পেলাম। তারপরেই শুনতে পেলাম একটা জয়ধ্বনি। দু চারজন শক্ত সমর্থ চেহারার লোক এসে ধাক্কা দিয়ে আমাদের সরিয়ে দিয়ে ভিড়ের মধ্যেই একটা প্রশস্ত পথ তৈরি করে দিল। আর জন-কয়েক ভক্ত পরিবৃত হয়ে এক মাল্যভূষিত ব্যক্তি সেই পথ দিয়ে যোগী মহারাজের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি তাঁর দু হাত যুক্ত করে মাথা দুলিয়ে যেন সবাইকে নমস্কার করে গেলেন। তাঁর বিনয় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম: ইনি কে?

একজন মৃদু স্বরে উত্তর দিলেন: সর্বস্বার্থ ত্যাগী।

পরিচয়?

কুম্ভীপাকের একজন নিঃস্বার্থ কর্মী। নিজে কেউই নন, অথচ লোকে ভাবে তিনিই সব। কাউকে তুলছেন, কাউকে নামাচ্ছেন। লোকে তাই এঁকে কিং মেকার বলে। ধর্মরাজের নামে যিনি বা

যাঁরা রাজ্যশাসন করবেন, তা ইনিই বলে দেন।

আমি দেখতে পেলাম যে যিনি পা টিপছিলেন তিনি উঠে সরে গেলেন এবং সর্বস্বার্থ ত্যাগী মহাশয় যোগী মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। আর যোগী মহারাজ তাঁর দু হাত প্রসারিত করে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন ; আর ত্যাগী মহাশয়ের মাথায় ঝুরঝুর করে কিছু ঝরে পড়ল। আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম ঃ ওঁর মাথায় কী পড়ল ?

সর্বস্বার্থ ত্যাগী মহাশয় যোগী মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

ভদ্রলোক বললেন ঃ বিভূতি। মানে ভস্ম।

তারপরেই বললেন ঃ প্রিয় ভক্তদের উনি নানা রকমের জিনিস উপহার দেন। রসগোল্লা সন্দেশ থেকে তুল আংটি বিদেশী ঘড়ি পর্যন্ত। শূন্যে হাত বাড়িয়ে তিনি এই সব বার করেন তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায়।

এ কথা শুনে আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না, দেবরাজ। ত্রিভুবনে ঘুরে আমি এ রকমের ক্ষমতা কোন ঋষির বা দেবতারও দেখি নি। তাঁরা বর দিতেন। রেগে গেলে শাপ দিতেন। কিন্তু সন্দেশ রসগোল্লা

বা ঘড়ি আংটি দিতে পারতেন না। যোগী মহারাজের ক্ষমতার কথা শুনে আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

ত্যাগী মহাশয় যোগী মহারাজের পায়ের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতেই ভক্তরা একটু দূরে সরে গেলেন। অত্যন্ত সঙ্গোপনে দুজনের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হল। তারপর যোগী মহারাজের নির্দেশে এক মহিলা কিছু কাগজপত্র এনে ত্যাগী মহাশয়ের হাতে দিতেই তিনি এক নজরে সেগুলির উপরে চোখ বুলিয়েই মাথা নাড়লেন এমন ভাবে যেন আর চিন্তার কোন কারণ নেই।

ঠিক এই সময়েই যোগী মহারাজের নির্দেশে তাঁর এক ভক্ত একটি কাঠের টুল এনে সামনে রাখতেই ত্যাগী মহাশয় কলের দম দেওয়া পুতুলের মতো তার উপরে লাফিয়ে উঠলেন এবং রাষ্ট্রভাষায় বক্তৃতা শুরু করলেন। প্রথমেই তিনি কোন আধা সরকারী সংস্থার কাজকর্মের প্রচণ্ড নিন্দা করলেন। সেই সংস্থা নাকি সনাতন ধর্মকে অশ্রদ্ধা করে ঈশ্বরের অবতার ও মহাপুরুষদের অলৌকিক ক্ষমতার উপরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে মনস্থ করেছেন। অর্বাচীন যাদুকররাও নাকি এই সব ক্ষমতাকে যাদুবিদ্যা বলতে দ্বিধা করছে না। তারা জানে না যে বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতার এখনও জীবিত। অচিরে তিনি এই সব নাস্তিককে নিজের কোলের উপর শুইয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে তাদের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবেন।

প্রবল করতালির মধ্যে ত্যাগী মহাশয় ঘোষণা করলেন যে যোগী মহারাজই ছদ্মবেশে সেই নৃসিংহ অবতার। তিনি অপেক্ষা করছেন এবং সময় পূর্ণ হলেই তিনি নিজ মূর্তি ধারণ করবেন। তারপরে টুলের উপর থেকে লাফিয়ে নেমে তিনি যখন বেরিয়ে আসছিলেন, তখন এক ভদ্রলোক এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে একখানি বই দিলেন। সেই বই-এর মলাটে যোগী মহারাজের একখানি রঙীন চিত্র। ত্যাগী মহাশয় সেই ছবি দেখবার পরে মুখ তুলতেই ভদ্রলোক গদগদ স্বরে বললেন: এতে আপনার কথাও লিখেছি।

ত্যাগী মহাশয় প্রশ্ন করলেন : পাতাটায় চিহ্ন দিয়ে দিয়েছেন তো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

পড়ে দেখব।

গ্রন্থকার ভদ্রলোক কৃতার্থ হয়ে গেলেন বলে মনে হল। কিন্তু ত্যাগী মহাশয় রাজপথের দিকে না গিয়ে ভিতর মহলে ঢুকে গেলেন। কয়েকজন তাঁর পিছনে যাবার চেষ্টা করতেই ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। একজন এসে আমার ঘাড়ে পড়ল। আর আমি পড়লাম আর একজনের ঘাড়ে। তারপরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পেরেই দেখলাম যে সমাচার পত্রনবিসই আমাকে সোজা করে দিয়েছেন। এইবারে আমার হাত ধরে অন্য দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন : এই ধারে আসুন।

আমি বেশ স্বস্তি বোধ করে বললাম : আপনি এসে গেছেন !

ভদ্রলোক বললেন : আপনার জন্য আসি নি। সর্বস্বার্থ ত্যাগীর গাড়ি দেখে ঢুকে পড়েছি। আমাদের কাছে এও একটা খবর।

তারপরেই প্রশ্ন করলেন : কেমন দেখছেন ?

বললাম : এঁরা প্রকৃতই ধার্মিক।

পত্রনবিসবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : সবাই তাই ভাবে বলেই আসে।

আপনি কি—

নিজের পাড়ার ব্যাপার বলেই একটু অসুবিধে হচ্ছে।

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন : কিছু দেখতে চান ?

বলে অঙ্গনের এক প্রান্তের একটি বন্ধ দরজার কাছে এনে বাইরে বের করে দিলেন ঠেলে। অন্ধকারে কিছু লোকজন কাজ করছে দেখলাম, আর নাকে একটা দুর্গন্ধ পেলাম। তারপরেই একজন গলা ধাক্কা দিয়ে আমাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিলেন। সমাচার পত্রনবিস আমাকে ধরে ফেলে বললেন : কিছু দেখতে পেলেন ?

বললাম : যা দেখলাম তার কিছুই বুঝলাম না।

কুম্ভীপাক সরকার মদ খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন বলে বেআইনি মদ এইখানে চোলাই হচ্ছে। আর এক দিকে নিয়ে গেলে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবেন না। সেখানে নিষিদ্ধ বিদেশী জিনিসের আড়ত। যে ভক্তটি যোগী মহারাজের পা টিপছিলেন, এ তাঁরই বাড়ি। এ সব ব্যবসায়ও তাঁর নিজের। সর্বস্বার্থ ত্যাগী তাঁর পৃষ্ঠপোষক। আবার দেখবেন তাঁকে ?

বলে আমাকে এমন একটা জায়গায় টেনে আনলেন যেখান থেকে আমি তিন তলার আলো দেখতে পেলাম। ত্যাগী মহাশয় বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটি ঘরে ঢুকলেন। তার পিছনে অনেকগুলি সুন্দরী কন্যা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ নাচ গান হবে ?

না। স্বয়ম্বর সভা। ত্যাগী মহাশয় যাকে পছন্দ করবেন, তাকে পাঠানো হবে তাঁর কাছে।

এরা কারা ?

সমাচার পত্রনবিস বললেন ঃ যোগী মহারাজ এদের দীক্ষা দিয়ে যোগ ব্যায়াম শেখাচ্ছেন।

এক ভদ্রলোক যে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছিলেন তা বুঝতে পারি নি। সিঁড়ি দিয়ে আর একজন লোক নেমে আসতেই তিনি চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কাজ হল ?

সেই লোকটি বলল ঃ গাড়িতে দিতে বললেন। একখানা কার্ড দিন এই থলের মধ্যে।

থলেটা তুলে ধরতেই ছটো বোতল তার ভিতরে ঠক-ঠক করে উঠল। ভদ্রলোক তাঁর পকেট থেকে একখানা কার্ড বার করে থলের মধ্যে দিয়ে বললেন ঃ এই বিদেশী মাল ঠেলতে পারে এমন মক্কেল আমি আজও দেখি নি।

বলে ছজনেই রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলেন।

সমাচার পত্রনবিস আমাকে বললেন ঃ আমাকেও এবারে ছুটতে

হবে। আমার খবরের জন্যে বার্তা সম্পাদকরা এখন মুখিয়ে আছে।

বলে তিনি নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি ফিরে এলাম যোগী মহারাজের সেই বিরাট ঘরে। এইবারে আমি একটি সম্ভ্রান্ত দম্পতিকে দেখলাম ধীরে ধীরে যোগী মহারাজের দিকে এগিয়ে যেতে। এঁদের আভিজাত্য দেখেই অনেকে পথ ছেড়ে দিচ্ছিলেন। আমিও এঁদের পিছনে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু একজন আমাকে বাধা দিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললেন: আপনি কোথায় যাচ্ছেন!

কাজেই আমার আর এগোন হল না। সেইখানে দাঁড়িয়েই আমি দেখলাম যে সেই দম্পতি দু হাত জুড়ে যোগী মহারাজকে নমস্কার করলেন। যোগী মহারাজ তাঁর শিষ্যাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: এ মা কে?

ভদ্রমহিলা কী শুনলেন জানি নে। নিজেই উত্তর দিলেন: উমা আমার ননদ।

এ কথা শুনেই ভক্তরা ধন্য ধন্য করে উঠলেন। বললেন: কী আশ্চর্য ক্ষমতা যোগী মহারাজের। নতুন মুখ দেখেই বলে দিয়েছেন, কোন্ সূত্র ধরে এসেছেন। উমা তো যোগী মহারাজের শিষ্যা। তার সঙ্গে কী সম্পর্ক তাই তিনি জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি ভাবলাম যে যোগী মহারাজ তো উমা কে তা জানতে চান নি, তিনি শিষ্যাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, এ মা কে?

যোগী মহারাজ কিন্তু নিজের প্রশংসায় গর্বিত হয়ে বললেন: ছেলে-মেয়ে কটি?

ভদ্রমহিলা বললেন: দুটি ছেলে, মেয়ে নেই!

মাথা নেড়ে যোগী মহারাজ বললেন: হবে, এইবারে হবে।

আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বামী বললেন: আর নয়, চল।

বলে স্ত্রীর কিছু আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে টেনে ফিরিয়ে আনলেন।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। আর দেখলাম যে আমার মতো আরও অনেকে খুবই বিস্মিত হয়েছেন। এরা এলেনই বা কেন, আর

এসেই এই ভাবে কেন ফিরে চললেন, তার কারণ আমরা কেউই অনুমান করতে পারলাম না। এঁদের দেখে ভজন গান বন্ধ হয়েছিল। এইবারে তা আবার শুরু হয়ে গেল। আমি কিছুটা পিছিয়ে এসেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সেই দম্পতি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যার সঙ্গে কথা বলছে তাকে আমি চিনি, দেবরাজ। সে সেবিকা সৎপথী।

তারা চলে যাবার পরে সেবিকা আমাকে দেখতে পেল। আর দেখেই চমকে উঠল। কাছে এসে বলল: আপনি এখানে ঠাকুরমশায়?

একই সঙ্গে আমিও তাকে একই প্রশ্ন করেছিলাম: তুমি এখানে?

সেবিকা নিজের কথা না বলে আমার কথাই বলল: সকালবেলায় আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করবার সুযোগ পাই নি। হাসপাতাল থেকে আপনাকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে?

মিথ্যা আমি বলতে পারলাম না। তাই স্বীকার করলাম: পালিয়ে এসেছি।

শরীরের কোন কষ্ট নেই তো!

না।

তবে ভালই করেছেন। মরবার জন্যেই তো লোকে হাসপাতালে যায়! আপনি যখন পালিয়ে আসতে পেরেছেন, তখন আর প্রাণের ভয় নেই।

এইবার আমি আবার প্রশ্ন করলাম: তুমি এখানে কেন এসেছ?

সেবিকা সৎপথী বলল: চাকরিটা বাঁচাবার চেষ্টায় চারি দিকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি। ডাক্তার সুখব্রত বৈদ্যর কাছেও গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, চাকরিটা যাতে না যায়, তার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। কিন্তু—

বলে সে মুখ নিচু করে নীরব হল। শর্তের কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারল না। কোন প্রশ্ন করতে আমারও সঙ্কোচ হল। বললাম: তারপর?

সেবিকা বলল ঃ একজন বললেন, যোগী মহারাজ কাউকে বলে দিলেই আমার তদন্ত বন্ধ হয়ে যাবে। সেই আশাতেই এখানে এসেছিলাম। কিন্তু এখানেও বড় ভয় হচ্ছে।

কেন ?

যোগী মহারাজ আমার দিকে চেয়ে বললেন, দীক্ষা নেবে! শুধু দীক্ষা তো নয়, এখানে থেকে যোগ ব্যায়াম শিখতে হবে কিছু দিন। তারপর --

সেবিকা সৎপথীর দু চোখ ছলছল করে উঠল। কোন রকমে সামলে নিয়ে বলল ঃ ওঁরা তো এঁকে ভণ্ড মহারাজ বলে গেলেন। মেয়ে হবার আশীর্বাদ করেছেন ঐ মহিলাকে, কিন্তু ওঁর তো জরায়ু নেই। সেই অপারেশনের সময়ে আমি তাঁর সেবা করেছিলাম।

ঠিক এই সময়েই একজন শক্ত সমর্থ লোক আমার গলাব পিছন দিকে তার ডান হাতটি রেখে দরজার বাইরে আমাকে বার কবে দিল। সেবিকা সৎপথীকে আর আমি দেখতে পেলাম না।

একটুখানি অগ্রসর হতেই অন্য এক ব্যক্তি আমাকে আটকাল। পিছন থেকে আদেশ করল ঃ দাঁড়ান একটু।

ভদ্রলোকের সাদা কাপড় জামা, কিন্তু কথা বলার ধরণটি পুলিশের মতো। তাই আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমার আপাদমস্তক পরীক্ষা কবে প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি ওখানে কেন গিয়েছিলেন ?

ভয়ে ভয়ে বললাম ঃ যোগী মহারাজের দর্শনের জন্যে।

ভদ্রলোক বললেন ঃ আমাকে ভয় পাবার দরকার নেই, আমি আপনাকে কিছু বলব না। যোগী মহারাজের সঙ্গে সর্বস্বার্থ ত্যাগীর যে কথাবার্তা শুনেছেন, তাই বলুন।

এইবারে আমি সাহস করে প্রশ্ন করলাম ঃ আপনি টিকটিকি, না সংবাদপত্রে কাজ করেন ?

ভদ্রলোক হেসে বললেনঃ ঠাকুরমশায় ঠিকই ধরেছেন। এইবারে সত্য কথাটা বলুন তো!

বললামঃ এ সব কথা জেনে আপনার কী দরকার, আগে তাই বলুন!

তার পরে বলবেন যে আপনি কিছুই জানেন না, এই তো! আসুন আমার সঙ্গে।

বলে তিনি আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন।

বুঝতে পারলাম যে সাহস দেখানো আমার উচিত হয় নি। আগে ভাগে সত্যি কথাটা বলে ফেলাই ভাল ছিল।

এবারে যে আমার কাছে এল, সে বললঃ আপনি তো ভেতরে অনেকক্ষণ ধরে ঘুর ঘুর করছিলেন, কিছু দেখেছেন কিনা বললেই তো পারেন।

আমি আর দেরি না করে সব কথা বলে ফেললাম। মদ চোলাই থেকে আরম্ভ করে সেবিকা সৎপথীর ভয়ের কথা পর্যন্ত। সব শুনে সে বললঃ যোগী মহারাজের সঙ্গে সর্বস্বার্থ ত্যাগীর কথাবার্তা কিছু শুনেছেন?

আজ্ঞে না। কাছে যেতে দেয় নি।

কেউ শুনেছে বলে মনে হয়?

ভক্তরা সব সরে গিয়েছিলেন দেখেছি।

খানিকটা তফাৎ থেকে সেই আগের ভদ্রলোক বললেনঃ ছেড়ে দাও ওঁকে।

ছাড়া পেয়ে আমি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে হনহন করে এগিয়ে গেলাম।

পরে আমি জানতে পেরেছিলাম দেবরাজ, যে এঁদের ব্যাপার-স্যাপার সবই সন্দেহজনক। তাই এঁদের পেছনে গোয়েন্দা লেগে আছে। কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে নাকি যোগী মহারাজের যোগাযোগ আছে। যোগ ব্যায়াম শেখাবার নামে তিনি সেই রাজ্যে যাতায়াত

করেন এবং সে দেশের কিছু শিষ্য এ দেশে গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে যাচ্ছে। সর্বস্বার্থ ত্যাগীর চরিত্রও খুবই সন্দেহজনক। তিনিও এই চক্রে আছেন কিনা তা জানবার জন্য ধর্মরাজের গোয়েন্দারা সর্বক্ষণ তৎপর হয়ে কাজ চালাচ্ছে। গোয়েন্দাদের আগে কাজের অসুবিধা ছিল না। সন্দেহজনক ব্যক্তিকে আটক করে কারাগারে রাখা চলত। কিন্তু বর্তমান সরকার বলেছেন যে অন্যের স্বাধীনতা খর্বের অধিকার সরকারেরও নেই! ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করার জন্যেই নাকি এঁরা দলবদ্ধ হয়ে পূর্বের সরকারের পতন ঘটিয়েছিলেন। এখন তাই সর্ব প্রকার স্বেচ্ছাচারিতা এমন কি দেশদ্রোহিতাও সরকার বরদাস্ত করতে বাধ্য। গোয়েন্দাদের কথায় আমি অকারণেই ভয় পেয়েছিলাম।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলতে চলতে আমি একটি ছোট উদ্যানের মধ্যে পৌঁছে গিয়ে দেখলাম যে এই স্থানটি অন্ধকার ও নির্জন। অথচ কয়েকটি বৃক্ষ আছে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেবার জন্যে। কিন্তু অদূরে একটি ছায়ামূর্তি দেখলাম। আমাকে দেখেই পালাবার চেষ্টা করছে। আমি অবিলম্বে তাকে ডেকে বললাম: কোথায় পালাচ্ছ বাবা?

লোকটি পিছন ফিরে আমার নামাবলীর দিকে তাকিয়ে বলল: আপনি কি যোগী মহারাজের চেলা?

বললাম: না।

লোকটি এবারে নির্ভয়ে কাছে এসে বলল: আমি ভেবেছিলাম, আপনি বোধহয় তাঁর কাছ থেকেই এসেছেন।

কিন্তু যোগী মহারাজকে তুমি ভয় পাও কেন?

সে বলল: যোগী মহারাজের নামডাক শুনে এক দিন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি ও আমাদের ছেলেবেলার বন্ধু ট্যাঁপা। ট্যাঁপাও আমাকে দেখে চিনতে পেরেছিল। কুম্ভীপাকে আসবার আগে আমরা তামিস্রের একটা গ্রামের স্কুলে পড়তাম। কিন্তু কেন জানি না, এখন ওর শিষ্যরা আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে বলে ভয়

দেখাচ্ছে। কিন্তু আমি তো মরতেই চাই, তবে ওরা আমাকে গুলি করে বা বিষ দিয়ে তো মারবে না, ওরা—

বলেই লোকটা কেঁদে ফেলল।

অনেকটা সামলে নেবার পরে বলল ঃ কিন্তু পুরনো কথা আমি কেন সবাইকে বলে বেড়াব বলুন! স্কুলের একটা মেয়ে ওর জন্যে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল বলে ও তাকে খুন করে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপরে কোথায় কী শিখে যোগী মহারাজ হয়ে ফিরেছে, আমি তার কী জানি!

দেবরাজ, এই লোকটার কথা আমার বিশ্বাস হল না। মনে হল যে সে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাচ্ছে বলেই তার এই বিপদ উপস্থিত হয়েছে। বললাম ঃ এত বড় যোগীর সম্বন্ধে এ সব কথা তুমি আর কাউকে বোলো না বাবা।

দেবরাজ, যোগী মহারাজের এই বাল্য বন্ধুর পরিচয় জানতে চেয়ে আমি মহা বিপদের সম্মুখীন হলাম। আপনারা অন্তর্যামী বলে অহংকার করেন, কিন্তু এ কথা আমার কোন কালেই বিশ্বাস হয় নি। চিরকাল আমি আপনাদের নিগ্রহ দেখেছি এবং কৃতকর্মের জন্য পস্তাতেও দেখেছি বারম্বার। নিজে অন্তর্যামী হলে কি একটু সমঝে চলতে পারতেন না! মর্ত্যের ঋষিরাও ধ্যানস্থ হয়ে নাকি ভূত ভবিষ্যৎ জানতে পারতেন। কিন্তু আমি মিথ্যা বলব না, আমার সে রকম কোন ক্ষমতা কোন কালেই ছিল না, এখনও নেই। যা দেখেছি সেই ভূত ভুলে যাচ্ছি, ভবিষ্যৎ আমার চিরকালই অন্ধকার, আর বর্তমানে প্রায়শই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকি। এখনও আমার সেই অবস্থা হল। কর্মভরসা দাস দু হাতে তার মুখ ঢেকে কাঁদছে। আর আমি তাকে কী সান্ত্বনা দেব তা ভেবে পাচ্ছি না। তার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

হ্যাঁ দেবরাজ, একটু আগে এই উদ্যানের একটি গাছের নিচে একটু-খানি স্থান পেয়ে ভারি আনন্দ হয়েছিল। কুম্ভীপাকে রাত্রি যাপনের জন্যে এই রকম একটা আশ্রয় পাওয়া নাকি ভাগ্যের কথা। রাজপথের দুধারে ফুটপাথগুলি রাতে গরু বাছুর কুলি মজুর ছাগল কুকুরে ভরে যায়,

বড় বড় বাড়ির গাড়িবারান্দাগুলি ভিখারিরা অধিকার করে আগে ভাগে। ভিখারিরা তেমন কষ্টসহিষ্ণু নয় বলেই রোদ জল ঝড় থেকে বাঁচবার জন্যে মাথার উপরে একটা ছাদ খোঁজে। কিন্তু যারা খেটে খায়, তারা সব রকম বিপদ আপদে অভ্যস্ত। তারা কারও কাছে কিছু চায় না, আশা করে না কিছু, ভাগ্যকে তারা খুব সহজ ভাবেই মেনে নিয়েছে। তাদেরই মতো কিছু লোক এখানেও গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। বৃষ্টি নামলে জলে ভিজবে, কিন্তু সেজন্য কারও কোন দুর্ভাবনা নেই।

কিন্তু কর্মভরসা দাস নিরাশ্রয় ছিল না। তাকেও এই খানে আশ্রয় নিতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম: তোমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নেই?

কর্মভরসা গম্ভীর স্বরে বলেছিল: আছে।

তবে তুমি তাদের কাছে যাচ্ছ না কেন?

এই কথার উত্তর না দিয়েই সে কেঁদে ফেলেছিল। সেই কান্না আর কিছুতেই থামছিল না। আমার মনে হল যে তার জীবনের কোন গভীর ক্ষত স্থানে আমি আঘাত দিয়ে ফেলেছি। এখন আপশোস করে আর কোন লাভ নেই।

ধীরে ধীরে অন্ধকার গভীর হল। নির্জন হল পথঘাট। নিরাশ্রয় ব্যক্তিরা এখন এই উদ্যানের নানাস্থানে নিদ্রামগ্ন। আমার চোখেও তন্দ্রার ঘোর নেমেছিল। সহসা মনে হল যে কর্মভরসা দাস আর কাঁদছে না। তবে কি সেও ঘুমিয়ে পড়ল? চোখ মেলে দেখলাম যে সে আমার পাশে নেই। মুখ তুলে একজন শীর্ণ লোককে দেখতে পেলাম, চোরের মতো সন্তর্পণে পা ফেলে উদ্যানের বাহিরে চলে যাচ্ছে।

আমার কী মনে হয়েছিল, এখন মনে পড়ছে না। নিঃশব্দে উঠে আমি তাকে অনুসরণ করলাম। লোকটা এ দিকে সে দিকে ঘুরে ফিরে আরও অন্ধকার একটি জায়গায় এসে দাঁড়াল। সামনে বাঁধের

মতো একটি উঁচু জায়গা। তার উপরে কী আছে তা দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ বাঁধের উপরটা আলোকিত হয়ে উঠতে লাগল। আর সমুদ্রের গর্জনের মতো কোন শব্দ নিকটতর হতে লাগল।

এক সময় মনে হল যে এই অন্ধকার রাতে বুঝি সূর্যোদয় হচ্ছে, ভয়ে পৃথিবী কেঁপে উঠছে থরথর করে। এ কোন্ প্রলয়ের সূচনা তা বুঝতে না পেরে আতঙ্কে আমার বুক কেঁপে উঠল।

তারপর আলোয় আলোকময় হয়ে গেল চারি দিক। যাকে আমি অনুসরণ করে এসেছিলাম, এই আলোয় তাকে আমি চিনতে পারলাম। সে এখন বাঁধের উপরে উঠবার পথ খুঁজছে। কিন্তু শব্দ শুনে মনে হচ্ছে যে পৃথিবী এবারে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়বে। এ কি দুঃসাহস কর্মভরসা দাসের! সে যে তরতর করে বাঁধের উপরে উঠে গেল! সে কি আলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঐ বিকট শব্দকে স্তব্ধ করে পৃথিবীকে রক্ষা করতে চায়! কিন্তু এ তো আলো আর শব্দ নয়, এ যে একটা বিরাট দৈত্য বিকট গর্জন করে এই দিকে ধেয়ে আসছে। কর্মভরসা তো এর নিচে নিজেই নিঃশেষ হবে যাবে!

মন স্থির করতে আমার এক মুহূর্তও সময় লাগল না। দেহে আমার অলৌকিক শক্তির সঞ্চার হল। আমি বিদ্যুৎ গতিতে উপরে উঠে গিয়ে কর্মভরসাকে টেনে নামিয়ে আনলাম। আর পরের মুহূর্তেই দেখতে পেলাম একটা লৌহ দানব বাসুকীর মতো বিরাট দেহ নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। নিমেষে অন্ধকার হয়ে গেল চারিধার, শব্দ কমে গেল, পৃথিবীর কাঁপুনি হল বন্ধ।

দেবরাজ, এরই নাম রেলগাড়ি। এই রেলগাড়ি চড়ে এক সঙ্গে সহস্র যাত্রী দূর দূরান্তে চলে যায় কয়েক ঘণ্টায়। কুম্ভীপাকের রেলগাড়ি আমি এই প্রথম দেখলাম। আর পরক্ষণেই কর্মভরসা দাস চিৎকার করে উঠল: ঠাকুরমশায়, কেন আপনি আমাকে নিচে নামিয়ে আনলেন?

আমি বললাম: নামিয়ে না আনলে যে তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না!

আমি তো সেই জন্যেই ওপরে উঠেছিলাম ঠাকুরমশায়। নিজের স্ত্রী-পুত্রকে নিরাশ্রয় হয়ে অনাহারে মরতে দেখবার জন্যে আমি বেঁচে থাকতে চাই নে।

কিন্তু আত্মহত্যা যে মহাপাপ!

আত্মহত্যাকে পাপ বলছেন! তবে কি না খেয়ে তিলে তিলে মরাকে আপনি পুণ্য বলবেন?

কর্মভরসার হাত আমি ছেড়ে দিই নি। সেই হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে যাবার সময়ে নানা রকমের প্রশ্ন করে তার ইতিহাস আমি জেনে নিলাম।

কিছু দিন আগে কর্মভরসা দাস ছিল একটি সরকারী কারখানার দক্ষ কারিগর। সৎ ও পরিশ্রমী বলে তার নাম ছিল। বিগত আন্দোলনের সময়ে ইউনিয়নের মুরুব্বিরা তাকে দলে টানতে চেয়েছিল। কিন্তু কর্মভরসা রাজি হয় নি। বলেছিল, আমি গরিব, মজুরি না পেলে আমার এক দিনও সংসার চলবে না। মুরুব্বিরা বলেছিল, আমরাই কি বড়লোক? আমরা আর কদিন এই আন্দোলন চালাতে পারি!

কিন্তু কর্মভরসা জানত, এই কারখানা বন্ধের জন্য তারা সারা বছর ধরে কত চাঁদা তুলেছে। তারাই তো চাঁদা দিয়েছে। কিন্তু মজুরি বন্ধ হলে তারা কিছু পাবে না। আর মজুররা কী খেয়ে বাঁচবে, সে চিন্তা নেই ইউনিয়নের মুরুব্বিদের। তাই কর্মভরসা বলেছিল, আমি মজুর, চিরকাল আমাকে খেটেই খেতে হবে। মালিকদের সঙ্গে বিবাদ করে আমরা কোন্ মুখে আবার কাজ করব?

মুরুব্বিরা বলল, মালিক কে? তোমরা না থাকলে কি কারখানা থাকবে?

তবু আমরা মালিক কোন দিনই হব না। মজুরই থাকব।

মুরুব্বিরা বলেছিল, আন্দোলন করে যখন মজুরি বাড়বে, তখন কি তোমরা সে মজুরির ভাগ নেবে না?

এ কথার উত্তর দেয় নি কর্মভরসা দাস! তবু তাদের রোষে

পড়েছিল। কারখানার দরজা বন্ধ হবার আগেই তারা কয়েকজন সরকারের শত্রুপক্ষের লোক বলে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। আর পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল সকলের আগে। তারপর স্ট্রাইক হল। কাজ বন্ধ হল কারখানার। মালিক ও মজুরদের মধ্যে কত কি হল, হাজতে বন্ধ থেকে তার কিছুই দেখল না কর্মভরসা দাস। শুধু কারখানার দরজা খোলবার পরে জানতে পারল যে তারা কয়েকজন ছাড়া পাবে না। তাদের বিরুদ্ধে মামলা ঝুলছে আদালতে। তারা নাকি বারুদ দিয়ে কারখানাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল।

অনেক দিন ধরে আদালতে এই মামলা চলল। তাদের পক্ষে উকিল মোক্তার দাঁড়াল না, ইউনিয়নের মুরুব্বিরাও এগিয়ে এল না। শুধু অনাথ স্ত্রী পুত্র কন্যারা এসে চোখের জল ফেলতে লাগল। কিন্তু ধর্মরাজ এখনও বেঁচে আছেন বলেই এই মিথ্যে মামলা ধোপে টিকল না। সব কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখে বিচারক সবাইকে বেকসুর ছেড়ে দিলেন। যে তারিখে তারা বারুদ দিয়ে কারখানাটা উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিল, বিচারক দেখলেন যে তার আগে থেকেই তারা পুলিশের হাজতে বন্ধ আছে।

কিন্তু এত সহজে সরকার তাদের ছেড়ে দিতে চাইল না। আপিল করল বড় আদালতে। বলল, তারিখটা লিখতে ভুল হয়ে গেছে। আবার কিছু দিন মামলা চলল। কিন্তু এবারেও তারা ছাড়া পেয়ে গেল। ধর্মরাজের আইনে তাদের দোষী সাব্যস্ত করা গেল না। বিচারকরা যুক্ত ভাবে রায় দিলেন যে আন্দোলন শুরু হবার আগে এ রকম একটা পরিকল্পনা কাজে লাগাবার চেষ্টার পিছনে কোন যুক্তি নেই। তাঁরা বেকসুর খালাস করে দিতেই চেয়েছিল। কিন্তু সরকারী উকিলের আপ্রাণ চেষ্টায় একটা সন্দেহের দাগ দেওয়া হল তাদের পিঠে এবং কারখানার কর্তৃপক্ষকে যথোচিত শাস্তি বিধানের ক্ষমতা দেওয়া হল। কাজেই কর্মভরসা দাস ও আরও কয়েকজন ছাড়া পেয়েও কাজ ফিরে পেল না। কারখানার আইনে বিচার হবার পরে তাদের চাকরি

গেল। বাসস্থানও গেল। দাগী আসামী নাম হবার জন্যে অন্য স্থানে কাজ পাবার সম্ভাবনাও শেষ হয়ে গেল।

আমি কর্মভরসা দাসকে বললাম: তোমার দুঃখ আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু এ তো তোমার একার দুঃখ নয়। তুমি একা কেন আত্মহত্যার পথটা বেছে নিলে?

কর্মভরসা দাস বলল: আমি তো পরে এই পথে এসেছি। আমার আগে একজন জেলে আত্মহত্যা করেছে। বাইরে তার স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়েছে শুনে সেও জেলে তাই করেছিল। আর একজন ছাড়া পাবার পরে সে তার পরিবারের কাউকে খুঁজে পায় নি। পুত্র কন্যা অনাহারে মারা যাবার পরে তার স্ত্রীকে আর কেউ দেখতে পায় নি।

আমি চমকে উঠে বললাম: শিশুরা অনাহারে মারা গেল! কেউ দেখল না তাদের!

কর্মভরসা দাস বলল: অনেক দিন দেখেছিল। কিছু দিন সঙ্গী সাথীরা, তারপর কিছু দিন আত্মীয়-স্বজনেরা। কিন্তু দেখবার তো একটা সীমা আছে। চিরদিন কেউ দেখতে পারে না!

দেবরাজ সত্য যুগে আমি রত্নাকর দস্যুকে রাম নাম করবার পরামর্শ দিয়েছিলাম। অনাহারে একাগ্র মনে রাম নাম করে সে বিশ্ববিখ্যাত কবি বাল্মীকি হতে পেরেছিল। কিন্তু এই কলি যুগে এক বেলা খেয়ে আমারই আর চলে না। রাতে আমার পেটও এখন চুঁই চুঁই করে। তাই অনাহারে হরিনাম করার পরামর্শ দিতে আমার ভয় হল। কর্মভরসা বোধহয় ভাববে যে আমি তার সঙ্গে রসিকতা করছি। তাই আমি তাকে কী পরামর্শ দেব তা ভেবে না পেয়ে খুবই অসহায় বোধ করলাম।

হঠাৎ এই অন্ধকার পথে একজন বলে উঠল: কে, কর্মভরসা না?

আমরা দুজনেই এক সঙ্গে থমকে দাঁড়ালাম। কর্মভরসা অন্ধকারেই তাকে চিনতে পেরে বলল: খোশামোদপটু খাসনবিস! তুমি এ

পাড়ায় এত রাতে ?

খোশামোদপটু বলল : একটা কাজে এ পাড়ায় এসেছিলাম, ভাবলাম তোমার খবরটা নিয়ে যাই। কিন্তু তোমার বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে কেন ? তোমার পরিবার কোথায় ?

জানি নে।

জানি নে মানে ?

সবাইকে আজ বার করে দেবার কথা ছিল।

তাই তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ ?

আমি আর চুপ করে থাকতে না পেরে বললাম : ইনি রেলগাড়ির নিচে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন।

অ্যাঁ !

বলে খোশামোদপটু পিছিয়ে গেল খানিকটা। তারপরে সামলে নিয়ে বলল : তা আমাকে এ সব কথা বল নি কেন ভাই ?

কর্মভরসা বলল : মন খারাপ করা ছাড়া তুমি আর কী করবে বল !

খোশামোদপটু এবারে কর্মভরসার হাত ধরে বলল : কিছু করতে পারি কিনা এইবারে দেখ।

তারপরে আমার দিকে ফিরে বলল : আপনিও আসুন ঠাকুরমশায়। এর জীবন বাঁচিয়ে আপনি আমাকেও কিছু করবার সুযোগ দিয়েছেন। তবে একটু পা চালিয়ে এগোতে হবে। রাত অনেক হয়েছে।

পথ চলতে চলতেই খোশামোদপটু আমাকে বলল : এরা আমাকে ঘৃণা করে ঠাকুরমশায়। কেন করে তাও আমি জানি। কিন্তু আমি কেন তাদের অপছন্দের কাজ করি তা এরা কেউ জানে না। কর্মভরসারা ভাবত যে ভাল কাজ করেই সোজা হয়ে চলা যায়। কিন্তু এখন বোধ হয় তার ভুল ভেঙেছে।

কর্মভরসা নীরবে পথ চলতে লাগল। কোন প্রতিবাদ সে করল না। খোশামোদপটু বলতে লাগল : কুম্ভীপাকে নির্বিবাদে বাস করতে হলে রাজনীতির ক-খ আপনাকে বুঝতে হবে। এ নিয়ে নিজের

মাথা ঘামাতে না চান তো একটা বড় দলে নাম লেখান আর তাদের কথায় ভেড়ার মতো এক সঙ্গে চলুন। এই পথই নিরাপদ। দুঃখ কষ্ট এলেও তা হবে সাময়িক।

আমি বললাম ঃ রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামালে বুঝি লাভ বেশি ?

সেও সাময়িক। প্রথমটায় লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠবেন, কিন্তু একটা চাল ভুল হলেই ধপাস করে মাটিতে পড়বেন। কোমর যদি না ভাঙে তো ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারলে সামলে ওঠাও অসম্ভব নয়।

কিন্তু এ সব কথায় আগ্রহ ছিল না কর্মভরসা দাসের। সে জিজ্ঞাসা করল ঃ কোথায় আমাদের নিয়ে যাচ্ছ ?

খোশামোদপটু বলল ঃ পতিতজীবন জানার বাড়িতে কীর্তন হচ্ছে দেখে এসেছি। পালাকীর্তন। শেষ হতে দেরি আছে।

কর্মভরসা চমকে উঠে বলল ঃ যিনি আমাদের মন্ত্রী ছিলেন, তাঁর বাড়িতে ? কিন্তু তাঁরই আদেশে তো আমার এই দুর্গতি !

খোশামোদপটু বলল ঃ সেই জন্যেই তো তাঁর কাছে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

অল্প সময়ে আমরা পতিতজীবন জানার বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। গেট দিয়ে ঢুকে দু ধারে দুটি সামিয়ানা। এক ধারে কীর্তন হচ্ছে। অন্য ধারে বহু পারিষদের মধ্যে মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন প্রাক্তন মন্ত্রী পতিতজীবন জানা। খোশামোদপটু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আমাদের দুজনকেই তাঁর নিকটে টেনে নিয়ে গেল।

পতিতজীবনবাবু তখন তাঁর পারিষদদের বলছিলেন ঃ আমি কী করেছিলাম জানো ? বাঁ হাতে তার কান ধরে ডান হাতে তার গালে—

খোশামোদপটু তাঁর মুখের কথা টেনে নিয়ে বলে উঠল ঃ এক বিরাশি সিক্কার চড় !

সঙ্গে সঙ্গে পতিতজীবনবাবু তার দিকে চেয়ে বললেন ঃ কে খাসনবিস ! তা তুমি এ কথা জানলে কী করে ?

আজ্ঞে হুজুর, আমি-যে স্বচক্ষে দেখেছি !

তাই বল। তখন থেকে আমি ভাবছিলাম, কে একজন উপস্থিত ছিল সেখানে। কিন্তু নামটা কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। তা এত দিন পরে আবার কী মনে করে এসেছ ?

খোশামোদপটু তার দুহাত কচলে বলল : আজ্ঞে হুজুর, আপনার হাতে কারও ভাল ছাড়া মন্দ হয়েছে, এ আপনারি শত্তুরেও বলতে পারবে না। অথচ এই লোকটার কপাল দেখুন। আপনি হুকুম দিয়েছিলেন কর্মফরসাকে তাড়াও, আর কারখানার কর্তারা জেলে ঢোকাল এই কর্মভরসাকে। এ বেচারা অনেক কষ্ট পেয়েছে হুজুর। স্ত্রীপুত্র নিয়ে আজ রেলের চাকার তলায় গলা পেতেছিল। আপনার দয়া না হলে—

বলেই সে পতিতজীবনবাবুর দু পা জড়িয়ে ধরল।

আরে করছ কী ! করছ কী !

বলে তিনি নিজের পা দুখানা সামান্য নেড়ে সবার দিকে তাকিয়ে বললেন : দেখছ তো কী বিপদ আমার ! এখন ক্ষমতায় নেই জেনেও তোমরা শুধু আমাকেই চিনে রেখেছ। তোমরা ঐ জনসেবক সরকারের কাছে যাচ্ছ না কেন ?

খোশামোদপটু জিভ কেটে বলল : ছিঃ ছিঃ, হুজুর। নিজের মুখে আপনি অমন কথা বলবেন না। জনসেবক সরকারকে কি আমরা চিনি নে ? তাঁকে দিয়ে কখনও কারও কোন উপকার হবে ?

পতিতজীবনবাবু এবারে ক্ষেপে উঠে বললেন : ভোটের সময় এ কথা মনে ছিল না ? তখন তোমরা কি করছিলে ?

ধমক খেয়ে খোশামোদপটু একটুও দমল না। নির্ভয়ে বলল : আর কখনও কি ভুল করবে ? ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়।

পতিতজীবনবাবু নরম হয়ে বললেন : তাই বলছ !

তারপর একটু ভেবে বললেন : এক কাজ কর তোমরা, সমাজ-বিরোধ সিংহ তো এক সময়ে আমার খুব অনুগত ছিল। এখন শুনছি জনসেবক সরকারের খুব নেওটা হয়েছে আমারই কুষ্টি কেটে। তাকে

গিয়ে বল যে আমি একে জনসেবকের কুটুম্ব ভেবে তাড়িয়েছিলাম। তাতেই কাজ হবে।

বুঝেছি হুজুর। আপনার আশীর্বাদ থাকলে কাজ নিশ্চয়ই হবে।

বলে খোশামোদপটু পতিতজীবনবাবুর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বলল: এসো কর্মভরসা।

এক সঙ্গেই আমরা সবাই বেরিয়ে আসছিলাম। কিন্তু পতিতজীবন-বাবু আমাকে একটা ধমক দিয়ে বললেন: আপনিও যাচ্ছেন কেন, আপনি বসুন এইখানে।

খোশামোদপটু খাসনবিস মুখ ফিরিয়ে বলল: তাই বসুন ঠাকুর-মশায়। আপনারও যদি কোন কাজ থাকে তো হুজুবকে বলুন। ব্যবস্থা উনি একটা করবেনই।

বলে সে কর্মভরসা দাসকে নিয়ে এগিয়ে গেল। আব আমি হতবুদ্ধি হয়ে অন্যান্য পারিষদদের পিছনে বসে পড়লাম।

দেবরাজ, বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না কী অদ্ভুত দূরদৃষ্টি এই দেশনেতা পতিতজীবন জানার। আমার আপাদমস্তক এক নজরে পরীক্ষা করেই তিনি বুঝতে পারলেন যে আমি কুম্ভীপাকের পুণ্যবান নই। তাই বললেন: আপনাকে হিপি বলে মনে হচ্ছে।

দেবরাজ, কুম্ভীপাকে হিপি মানে বিদেশী। তাই আমি কিছু গোপন করার সাহস না পেয়ে বললাম: আপনি ঠিকই ধরেছেন।

ভদ্রলোক সগৌরবে তাকালেন তাঁর পারিষদদের দিকে, তারপরে বললেন: আপনার পরিচয়?

বললাম: আমার নাম ব্রহ্মপুত্র দেবর্ষি। ব্রহ্মলোক থেকে অমরাবতী যাবার পথে ঢেঁকি ভেঙে কুম্ভীপাকে পড়েছি।

উদ্বিগ্ন ভাবে তাঁর পারিষদরা চিৎকার করে উঠলেন! কেউ বললেন: আপনার ভাল চিকিৎসা হয়েছিল তো?

কেউ বললেন: আপনার ঢেকি মেরামত হয়ে গেছে তো?

আবার কেউ বললেনঃ কুম্ভীপাকে আপনার যত্নের ত্রুটি হচ্ছে না তো ?

এই কটা প্রশ্নই আমি শুনতে পেয়েছিলাম। বাকি সব প্রশ্নগুলিও একই সঙ্গে উচ্চারিত হওয়ায় আমি তা বুঝতে পারি নি। বললামঃ চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয় নি। জ্ঞান হবার পরে চোখ মেলেই দেখি যে আমি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছি। কিন্তু আমার ঢেঁকির সন্ধান এখনও পাই নি।

পতিতজীবনবাবু বললেনঃ কী আশ্চর্য! এত বড় খবরটা জন-সেবক সরকার চেপে গেছে!

আমি বললামঃ আর আমার বীণাটা বগল থেকে কোথায় ছিটকে পড়েছে—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে একজন বললেনঃ তাও এখনও পান নি ?

পতিতজীবনবাবু বললেনঃ পাবেন না। শুধু আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কি সরকার চালানো যায়! চারি দিকে এখন অরাজকতা! গুণ্ডার রাজত্ব চলছে।

পারিষদদের কেউ বললেনঃ এর একটা বিহিত করতে হবে।

কেউ বললেনঃ বিহিত নয় হে, একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়তে হবে।

কেউ বললেনঃ কালই বিধান সভায় এই প্রসঙ্গ তুলতে হবে।

কেউ বললেনঃ শুধু বিধান সভায় কেন, এটা একটা জাতীয় সমস্যা। জরুরি অবস্থার মতো রাজধানীর লোকসভায় এর আলোচনা হওয়ার দরকার। সর্বস্বার্থ ত্যাগী মহাশয় এখন এখানে, তাঁর উপরেই ভার দিতে হবে।

কিন্তু পতিতজীবনবাবু এতক্ষণ নীরবে কিছু ভাবছিলেন। হঠাৎ মুখ তুলে বললেনঃ আপনি কোন্ হোটেলে আছেন দেবর্ষি মহাশয় ?

হোটেল!

একজন পারিষদ বললেন ঃ হ্যাঁ। দরকার মতো আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে তো ? সেইজন্যেই—

বললাম ঃ বুঝেছি। কিন্তু আমি তো এখন পথে পথেই ঘুরে বেড়াচ্ছি।

অন্য পারিষদ সবিস্ময়ে বললেন ঃ পথে পথে ?

তৃতীয় পারিষদ বললেন ঃ বুঝেছি।

সবাই এক সঙ্গে তাঁর দিকে তাকালেন দেখে বললেন ঃ উনি যে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন, সে কথা আমাদের বলতে চাইছেন না। ওঁকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখে বদমাইশরা ওঁর সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল। তাই না ?

পতিতজীবনবাবু এইবারে হাঁক দিলেন ঃ পদদলিত !

আজ্ঞে কর্তা ?

বলে একজন ভৃত্য মুখ বাড়াতেই তিনি বললেন ঃ দেবর্ষিবাবু আমার অতিথিশালায় থাকবেন, তাঁর খাওয়ার ভাল ব্যবস্থা কর। আর চা আনো সবার জন্যে।

অল্পক্ষণ পরে চিনেমাটির পেয়ালায় চা এল। দেবরাজ, এই চা যে কী বস্তু, আপনারা তা জানেন না। কবে কোন্ কালে সমুদ্র মন্থনের পর আপনারা কয়েক ফোঁটা অমৃত চেটেছিলেন। তাই এখনও জিভ বার করে চুকচুক করে বলেন, কী খেয়েছিলাম! কিন্তু কুম্ভীপাকের এই চা চেখে দেখলে লজ্জায় অধোবদন হবেন এই ভেবে যে দ্রোণাচার্যের ছেলে অশ্বত্থামার মতো পিটুলিগোলা জল খেয়েই এত দিন দুধ খেয়েছি ভেবেছেন। কুম্ভীপাকের পুণ্যবানরা এই চায়ের জন্যে সমুদ্র মন্থন করে নি। চায়ের চাষ করে দেশ বিদেশে এই অমৃত বিতরণ করছে। কুম্ভীপাকের হাটে বাজারে মাটির ভাঁড়ে, কাচের গ্লাসে বা চীনেমাটির পেয়ালায় সর্বক্ষণ এই চা বিক্রি হচ্ছে। এখানে এক পেয়ালা গরম চা খেয়ে আমার মনে হল যে চায়ের বদলে এদের অমৃত খেতে দিলে এঁরা থু থু করে ফেলে দেবেন।

এই চা খেতে খেতেই সবাই তাঁদের কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। পতিতজীবনবাবু কাল দুপুরে আহারান্তে আমাকে বিধান সভায় নিয়ে যাবেন এবং দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আমাকে বসতে দেবেন। তিনি যথারীতি বিরোধীদলের নেতার আসনে বসবেন। কে কী ভাবে আমার প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন তা স্থির হবার পরে সবাই বিদায় নিলেন। শুধু জীহুজুর বর্ধন নামে এক ঘনিষ্ঠ পারিষদ বসে রইলেন।

পতিতজীবনবাবু এইবারে তাঁকে কাছে ডেকে বললেনঃ আপদকে উড়িয়ে দিচ্ছ না কেন?

জীহুজুর বর্ধন বললেনঃ সেই কথাই তো ভাবছি।

আর কত দিন ভাববে?

অন্ধকারে দৈত্যের মতো এক ব্যক্তি ঘোরাঘুরি করছিল। এইবারে এগিয়ে এসে একটা নমস্কার করতেই আমি চমকে উঠলাম। মনে হল যে আমি বুঝি থানার হাজতের সেই ধেনো জহ্লাদকেই দেখছি চোখের সামনে। জীহুজুর বর্ধন তাকে বললেনঃ দিন কতক পরে এসো ভাই।

লোকটি কোন কথা না বলে নিঃশব্দে চলে গেল।

দেবরাজ, ওই ওড়ানো শব্দটির মানে আকাশে ঘুড়ি ওড়ানো নয়। এটা একটি রাজনৈতিক শব্দ। এর একটা গভীর তাৎপর্য আছে। সমাচার পত্রনবিসের কাছে আমি এর অর্থ জেনেছিলাম। আর এমন ভয় পেয়েছিলাম যে তাঁকেও আমি এই ঘটনার কথা বলি নি।

পরদিন প্রভাতে আমি একদল বালককে একটি সামিয়ানার নিচে দেখতে পেলাম। তাদের মধ্যে একজন বললঃ এই ভাবে, ঠিক এই ভাবে চেয়ারটা ছুঁড়বি। তার পরে এই ভাবে মাথা নিচু করে নিজের মাথা বাঁচাবি।

আর একজন বালক বললঃ কিন্তু ক্লাসে তো চেয়ার একটাই!

প্রথম বালকটি মুহূর্তের জন্যে বিচলিত হয়েছিল। তার পরেই বললঃ ঠিক আছে। পকেটে আমরা ইট পাটকেল নিয়ে যাবো।

কিন্তু আগে ছুঁড়ব বই খাতা, বুঝলি ?

বুঝলাম।

বলে অন্য বালকেরা প্রস্থান করল।

যথাসময়ে আমরা পতিতজীবনবাবুর গাড়িতে চেপে বিধান সভায় এলাম। দেবরাজ, এই সভা আপনার সভার মতো নয়। বিশ্বাবসু বা তুম্বুরু গন্ধর্ব এখানে অতিতান গান গায় না। মেনকা তিলোত্তমাও আসে না নাচতে। এই সভায় জনতার প্রতিনিধি স্ত্রী পুরুষেরা বসেন দেশ শাসনের জন্য। এখানকার জন্য ধর্মরাজ তাঁর এক প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। কিন্তু বিশেষ অধিবেশন ছাড়া এ সভায় তিনি রোজ বসেন না। তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম হল সভা সমিতির উদ্বোধন করে একটি সুললিত ভাষণ দান। সেটি তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারী লিখে দেন। বিশেষ অধিবেশনে তাঁকে এই সভায় যে ভাষণটি দিতে হয়, সেটি রচনা করেন তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলী। এই মন্ত্রীমণ্ডলীরই দু একজনকে পালা করে এই সভার অধিবেশনে বসতে হয়! তাঁদের দলের প্রতিনিধিরাই দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময়ে সেনাবাহিনীর কাজ করেন। এই বিধান সভার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হল যে এখানে কোন বিধান মেনে চলবার প্রয়োজন নেই। উপস্থিত প্রতিনিধিরা যথেচ্ছ আচরণ করতে পারেন। প্রশ্নোত্তরের নামে বচসা থেকে গালাগালি হাতাহাতি ও চেয়ার টেবিল ছোঁড়া ছুঁড়ি চলতে পারে। কিন্তু কোন মারণাস্ত্র ব্যবহারের প্রচলন এখনও হয় নি। বোমা পটকা গোলাগুলি এখনও সভার বাইরে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে অনেকেই আজকাল বলছেন যে কোন বিধিনিষেধ যখন নেই তখন সে সব ভিতরে ব্যবহারের বাধা কিসের !

সভার কার্য শুরু হতেই একজন নির্দল বিধায়ক বললেন : গত বছরের বন্যায় যে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে—

সরকার পক্ষের এক বিধায়ক তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বললেন : এ নিয়ে এ যাবৎ অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। নতুন কোন বিষয় থাকলে বলুন।

বিষয়টা নতুনই। আমি এ বছরের খরার প্রসঙ্গে আসছি। চাষীরা গত বছরের বন্যার ক্ষতি সামলে উঠবার আগেই এ বছর খরা দেখা দিয়েছে।

এ তো প্রাকৃতিক বিপর্যয়! এ নিয়ে আলোচনা অবান্তর।

কিন্তু নির্দল বিধায়ক নাছোড়বান্দা। তিনি বললেন: এই প্রচণ্ড খরাতেও চাষীদের চাষের জল দেওয়া হচ্ছে না।

বিরোধী পক্ষ সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন: কেন?

নির্দল বিধায়ক বললেন: টাকা, টাকা চাইছে সরকারী লোক।

ঘুষ চাইছে?

না। জলের জন্যে টাকা জমা দিতে বলছে। কিন্তু এবারে তাদের হাতে জমা দেবার মতো টাকা কোথায়!

একজন মন্ত্রী উত্তর দিলেন: টাকা কোথায় মানে? কত কোটি টাকা তাদের সাহায্য দেওয়া হয়েছে জানেন?

নির্দল সদস্য বললেন: তাও জানি। কিন্তু আমি বলছি যে দরিদ্র চাষীদের কল্যাণের জন্য এ বছর চাষের জলটা বিনা মূল্যে দেওয়া হোক না। তাতে তাদের অনেক বেশি সাহায্য হবে এবং ভাল ফসল হলে আমরাও খেয়ে বাঁচব।

পতিতজীবন জানা এইবারে মুখ খুললেন। বললেন: সরকারী সাহায্যের টাকা সরকারী লোকই যে খেয়ে ফেলেছে, সে কথা আপনি বলছেন না কেন?

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দলের বিধায়করা চেঁচিয়ে উঠলেন: বলুন, কিছু গোপন না করে সত্য কথা বলুন। আমরা সবাই জানি যে সরকারী সাহায্যের নামে একটা প্রহসন হয়েছিল।

কয়েকজন অত্যুৎসাহী বিধায়ক তাঁর কাছে লাফিয়ে গিয়ে তাঁকে চেপে ধরে ঝাঁকাঝাঁকি করে বলতে লাগলেন: আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন, আমরা তো আছি।

নির্দল বিধায়ক এবারে কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন: না না, আমার

কোন অভিযোগ নেই, কোন দুর্নীতির কথা আমার জানা নেই।

তবে কী জন্যে এসেছেন এখানে ?

চাষীদের দুর্দশা দেখে ভেবেছিলাম—

বলতে বলতে তিনি বিরোধী বিধায়কদের পায়ের নিচে দিয়ে গলে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। আর মন্ত্রীমশায়ও তাঁর কপালের ঘাম রুমালে মুছে নিশ্চিন্ত হলেন।

এইবারে জীহুজুর বর্ধন আমার ঢেঁকির প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণের উত্তরে এক মন্ত্রী বললেন : বিষয়টি যত্নের সঙ্গে অনুসন্ধান করে দেখা হবে।

তাঁর অভিজাত চেহারা ও সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনে আমার মনে হল যে তিনিই বোধহয় জনসেবক সরকার। এঁর উত্তর শুনেই পতিতজীবন

দুপক্ষে বাকযুদ্ধ ও গালাগালি বর্ষণ শুরু হয়ে গেল।

জানা তাঁর সরকারের দায়িত্বহীনতা নিয়ে এক ওজস্বিনী ভাষণ দিয়ে সভাকক্ষ উত্তাল করে দিলেন। দুপক্ষে বাকযুদ্ধ ও গালাগালি বর্ষণ

শুরু হয়ে গেল।

দেবরাজ, এই মারমুখো বিধায়কদের দেখে আমার দ্বাপর যুগের কথা মনে পড়ে গেল। রাজসূয় যজ্ঞের পর মহারাজা যুধিষ্ঠির যখন কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে অর্ঘ্য দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন, ঠিক তখন শিশুপালও এই রকম উন্মত্ত হয়ে কৃষ্ণকে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু সেদিনের সভায় নির্বাক হয়ে সবাই দুপক্ষের বাকযুদ্ধ উপভোগ করেছিলেন। কিন্তু এখানে দুপক্ষের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে জনসেবক সরকার কৃষ্ণের ন্যায় কোন সুদর্শন চক্র দিয়ে শিশুপাল রূপী পতিতজীবন জানার মুণ্ডচ্ছেদ করলেন না। উপরন্তু পতিতজীবন জানার বিধায়করাই কিছু টেবিল চেয়ার ছোঁড়া-ছুঁড়ির পরে রণক্লান্ত হয়ে এক যোগে সভাকক্ষ ত্যাগ করে গেলেন।

এদের সঙ্গে পতিতজীবনবাবুকেও বেরিয়ে যেতে দেখে আমি কী করব ভাবছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে একজন আমার নামাবলীতে একটা টান মেরে বললেন: বেরিয়ে আসুন তাড়াতাড়ি।

পিছন ফিরেই আমি সমাচার পত্রনবিসকে দেখতে পেলাম এবং সাহস পেয়ে তাঁরই সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। ময়দানের দিকে চলতে চলতে তিনি বললেন: বিরোধী দলের সেনাবাহিনী বিধান সভা ঘিরে ফেলেছে। এইবারে বোমা ছুঁড়বে।

সভয়ে বললাম: তবে তো রীতি মতো যুদ্ধ বেধে যাবে!

তা না হলে টেনে বার করে আনলাম কেন!

নির্দল বিধায়কের কথা মনে পড়ে গেল। বললাম: গোড়ার দিকে এক বিধায়ক তো একটা ভাল প্রস্তাব করেছিলেন!

পত্রনবিসবাবু বললেন: নির্দল থেকে তো তিনি কোন কাজ করতে পারবেন না!

কেন?

তাহলে আমাদের পাড়ার এক নির্দল ভদ্রলোকের কথা বলি।

বলে নিজের চারি ধারে চেয়ে বললেন: সেই ভদ্রলোকের বাপ

পিতামহ দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন, আর নিজের সারা জীবনই কাটিয়েছেন কারাগারে। অবস্থাপন্ন অকৃতদার পরোপকারী নমস্য ব্যক্তি। নিজের পয়সায় গরিবের সেবা করেন কাউকে না জানিয়ে। কোন লোভ নেই, সম্মানের কাঙাল নন। আমরা ভাবলাম, বিধান সভায় পাঠাবার জন্যে তিনিই যোগ্য লোক। তাঁর ওজর আপত্তি না শুনে পাড়ার ছেলেরা তাঁর পক্ষে প্রচার শুরু করে দিল। কিন্তু ভোট যুদ্ধ শুরু হবার আগেই তিনি দিন দুপুরে খুন হয়ে গেলেন।

আমি সবিস্ময়ে বললামঃ কেন?

সমাচার পত্রনবিস একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেনঃ এরই নাম রাজনীতি। তাঁর মতো ব্যক্তি জনসাধারণের প্রতিনিধি হতে চাইলে কোন দলই জিততে পারবে না! কাজেই উড়িয়ে দাও তাঁকে।

হ্যাঁ দেবরাজ, এই প্রসঙ্গেই আমি উড়িয়ে দেওয়া শব্দটির মানে জানতে পারলাম। রাজনৈতিক প্রয়োজনে কোন ব্যক্তিকে কুম্ভীপাক থেকে সরিয়ে দেবার নাম উড়িয়ে দেওয়া। পূর্বে এ কাজ অত্যন্ত সঙ্গোপনে হত। কোথায় কী ভাবে একজন লোক গুম হয়ে গেল তা কেউই জানতে পারত না। কিন্তু এখন এই প্রয়োজন এত বেড়েছে যে খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব হচ্ছে না। কখনও একটা বোমা ফেলেও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, কখনও বা নৃশংস ভাবে ছুরি চালিয়েও হত্যা করা হচ্ছে।

পত্রনবিসবাবু বললেনঃ এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে কোন দলই বেশি চেঁচামেচি করল না। তার কারণ সব দলই কিছু সুবিধা হবে বলে ভেবেছিল। কুম্ভীপাকে ক্ষমতায় আসতে হলে দলে যোগ দিতে হবে, আর দলে ঢুকে শুধু দলাদলি। জনতার কথা ভাবলেই মার খেতে হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এই রাজনীতি কি ধর্মরাজ প্রবর্তন করেছেন?

পত্রনবিসবাবু বললেনঃ পাগল হয়েছেন আপনি! এ নীতি

রাজার নয়, প্রজারও নয়। এ দলের নীতি, দলাদলির নীতি। রাজার নীতি কি হবে তাই নিয়ে দলাদলি! সব দলের কর্মসূচী আছে—কারও হাজার দফা, কারও লক্ষ দফা, কারও বা কোটি দফা। জনতার রায়ে ক্ষমতায় আসবার জন্যে এই সব কর্মসূচী। তারপর ক্ষমতায় এলে প্রথম কাজ সেই কর্মসূচীটি আগুনে পুড়িয়ে দলের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সব রকমের চেষ্টা।

আমি বললাম ঃ ধর্মরাজ এ সব দেখেন না?

দেখবেন কী করে! মন্ত্রীরা তো তাঁকে আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙলে তাঁকে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতে হয়। কিছু করার ক্ষমতা নেই তো! আর এই কুম্ভীপাক ছাড়া আর সব নরকে এখন জনগণের শাসন। কুম্ভীপাকের ওপরেও তাদের কড়া নজর।

হায় হরি!

বলে আকাশের দিকে তাকাতেই আমি একটি ছায়াপথ দেখে প্রশ্ন করলাম ঃ ও কিসের পথ?

পত্রনবিসবাবু সেই দৃশ্য দেখে বললেন ঃ বোধহয় ক্ষার কর্দমের উপগ্রহ কুম্ভীপাকের আকাশ থেকে গোয়েন্দাগিরি করছে।

এতে কেউ বাধা দিচ্ছে না কেন?

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিলেন ঃ এ সব দেখবার সময় আছে কার বলুন!

কেন জানি না আমারও একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

কিছু দূর অগ্রসর হয়েই দেখতে পেলাম যে নানা দিক থেকে জনস্রোত এই ময়দানের দিকে ছুটে আসছে। শুধু পুরুষ নয়, মহিলারাও সমানে পা ফেলে ছুটে চলেছে। আর শুধু পদব্রজেও নয়, নানা আকার ও আকৃতির যানবাহনে চেপে পিঁ-প্যাঁ ভ্যাঁক-ভ্যাঁক শব্দে চারিদিক মুখর করে সবাই ছুটছে। অপরিসীম বিস্ময়ে সমাচার পত্রনবিসের মুখের

দিকে তাকাতেই তিনি বললেন ঃ খেলা।

খেলা মানে ক্রীড়া দেবরাজ। আপনাদের কিছু গোপন ক্রীড়া আছে বলে শুনেছি। মাহিষ্মতীর রাজা কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুনের জলক্রীড়ার কথাও শুনেছি। তিনি নাকি নর্মদায় নেমে তাঁর সহস্র বাহু দিয়ে জলস্রোত রোধ করে রমণীদের সঙ্গে ক্রীড়া করতেন। দ্বাপরে যুধিষ্ঠিরের অক্ষক্রীড়ার কথাও শুনেছি। ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় সেই ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়েছিল। কিন্তু ময়দানে যুদ্ধ হয় বলেই আমি জানি। তাই আমার দৃষ্টিতে কৌতূহল দেখে পত্রনবিসবাবু বললেন ঃ কুম্ভীপাকের ফুটবল খেলা বুঝি দেখেন নি! তা এখন তো আর টিকিট পাবেন না। রাত্রে অন্ধকার থাকতেই আপনার নামাবলীর খুঁটে চিঁড়ে গুড় বেঁধে লাইনে এসে দাঁড়াবেন। বাকি রাতটুকু ঘুমোতে পারেন, কিন্তু প্রাতঃকৃত্যের জন্যে লাইন ছাড়বেন না। ছাড়লেই গেল, নতুন করে লাইনে দাঁড়ালে কপালে আর টিকিট জুটবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ সবাই কি এই ভাবেই টিকিট সংগ্রহ করে?

পত্রনবিসবাবু বললেন ঃ নানা রকমের টিকিট আছে তার নানা নিয়ম! আপনার জন্যে এই নিয়ম। তবে ট্যাকে টাকা থাকলে ব্ল্যাকে টিকিট পেয়ে যাবেন।

ঘুষ দিয়ে?

কিন্তু আমার কথা শুনেই তিনি চটে বললেন ঃ ঘুষ দিয়ে আপনি খেলার টিকিট পাবেন! আপনি কি মর্ত্য ভেবেছেন কুম্ভীপাককে? সেখানে তো শুনেছি দেবতার কৃপালাভের জন্যেও মানুষকে ঘুষ দিতে হত। শুধু স্তব স্তুতিতে হত না, যজ্ঞ করে ফুল নৈবিদ্য চড়িয়ে পাঁঠা বলি দিয়ে। যে দেবতার যে নিয়ম। শুধু ভোলা ভালা শিবঠাকুরই নাকি সস্তায় সন্তুষ্ট হতেন। মাথায় একটু গঙ্গাজল আর বেল পাতা, একটা ধুতরোর ফুল আর কয়েক পয়সার গাঁজা। এটুকু ঘুষ না পেলে সে বুড়োও ভুলত না।

আমি কী উত্তর দেব তা ভেবে পেলাম না। সমাচার পত্রনবিস নিজেই একটু শান্ত হয়ে বললেন: কুম্ভীপাকে ঘুষের কারবার নেই। একে আপনি বাঁ হাতের খেলা বলতে পারেন। একটু এ দিক ও দিক করে কিছু টিকিট বাইরে চলে আসে, তাই বিক্রি হয় চড়া দামে। তবে ভুলক্রমে বেশি বিক্রি হলেই বিপদ। বিশেষ করে ক্রিকেট খেলার টিকিট। সে তো এক দেড় ঘণ্টার খেলা নয়। সে হল সারা দিনের খেলা। ম'য়েরা কোলের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আসে, তারপর প্রাতঃকৃত্য থেকে শয়ন ভোজন সবই এই মাঠে।

চলতে চলতে কখন যে আমরা জনস্রোতের সঙ্গে সামিল হয়ে গিয়েছিলাম তা বুঝতে পারলাম একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে। পত্রনবিস-বাবু আমাকে ধরে না ফেললে আমি দূরে ছিটকে পড়তাম। কোন রকমে সামলে নিয়েই দেখতে পেলাম যে তিন চারটি মহিলার একজন তাঁর কনুয়ের একটা ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁদের পরিধানে এমন সূক্ষ্ম বস্ত্র যে উর্ধাঙ্গ অনাবৃত বলেই আমার মনে হল। আহা, কী রূপ দেবরাজ, এই বুড়ো বয়সেও আমার মাথা ঘুরে গেল। পরক্ষণেই এক মহিলা এসে আমার ঘাড়ে পড়লেন। আমার গতি বোধহয় হ্রাস পেয়েছিল, তাই সেই দ্রুতগামিনী মহিলা এসে ধাক্কা খেলেন আমার সঙ্গে। নিতান্ত লজ্জিত ভাবে যুক্ত করে আমি বললাম: ক্ষমা করবেন মা।

মা!

বলেই সেই মহিলা তাঁর পায়ের চটি জুতো খুলে আমার মুখের উপরে তুললেন। পত্রনবিসবাবু আমাকে টেনে সরিয়ে দিয়ে বললেন: অপরাধ নেবেন না। এঁরা সেকেলে লোক, ভব্যতা এখনও শেখেন নি।

কিন্তু এতেও আমি রক্ষা পেতাম না। আমাকে রক্ষা করলেন আর একজন মহিলা। তিনি প্রথমার হাত ধরে বললেন: চলে এসো মা, দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করলে খেলা আরম্ভ হয়ে যাবে।

কাজেই তাঁরা একসঙ্গে অন্তর্হিত হলেন। পত্রনবিসবাবু এইবারে

আমাকে পথ থেকে একটি উদ্যানের মধ্যে টেনে এনে বললেন : বসুন এইখানে।

আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম আর তিনিও তা বুঝতে পেরে বললেন : একটা সিগারেট খান।

বলে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে নিজেও একটা ধরালেন।

সিগারেটের ধোঁয়ায় খানিকটা ধাতস্থ হয়ে আমি বললাম : পত্রনবিসবাবু, ঐ মহিলার কাছে আমি কী অপরাধ করলাম, তা কিন্তু বুঝতে পারি নি!

পত্রনবিসবাবু বললেন : এ বোধ থাকলে কি আর পথে ঘাটে কাউকে মা বলতে!

মা বাবা তো সম্মানের সম্বোধন!

কানাকে কানা বললে সম্মান হয়? না চাষাকে চাষা বললে সম্মান হয়! এও তেমনি। কোন বয়স্কা মহিলাকে মা বললে তিনি কি ভাববেন না যে আপনি তাঁকে বুড়ি ভাবছেন! অথচ তিনি হয়তো তখনও আঁটো-সাঁটো জামাকাপড় পরে খুকি সাজবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু আর একজন মহিলা তো তাঁকে মা বললেন!

সে তো নিজের মেয়ে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম : মা মেয়ে! আমি তো তাঁদের দুই বোন ভেবেছিলাম!

সঙ্গে সঙ্গে পত্রনবিসবাবু বললেন : ঠিক এই জন্যেই তিনি চটে গিয়েছিলেন। আপনি যদি তাকে মা না ভেবে মেয়ে ভাবতেন, তাহলে তিনি খুশী হতেন। এবার থেকে মনে রাখবেন এই কথা। কোন মাকে মেয়ে বলে ভুল করলে আপনার অপরাধ হবে না, কিন্তু ভুল করে মাকেও মা বলবেন না। ঠিক একই কারণে চাষাকে ভদ্রলোক বলতে পারেন; কিন্তু চাষা বলবেন না। আবার কোন ভদ্রলোককে চাষার অধম দেখেও তাঁকে ভুল করেও চাষা বলবেন না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি বললাম : বুঝেছি।

দেবরাজ, উর্বশীর কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। অর্জুন যখন আপনার কাছে অস্ত্রশিক্ষার জন্য এসেছিল, তখন এক দিন আপনার সভায় উর্বশীর নৃত্য দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল। আপনি তার পরেই উর্বশীকে অর্জুনের কাছে অভিসারে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু অর্জুন তাকে মা বলে ফিরিয়ে দিয়েছিল, আর উর্বশী অপমানিত হয়ে অর্জুনকে নপুংসক হবার অভিশাপ দিয়েছিল। এই ঘটনার পরে আপনি আমাদের বুঝিয়েছিলেন যে সত্য যুগে উর্বশী পুরুরবার সঙ্গে দীর্ঘ কাল সংসার করেছিলেন এবং তাঁদেরই বংশে পাণ্ডবের জন্ম বলে অর্জুন ধর্মানুসারে কাজ করেছিলেন। কিন্তু আজ আমি প্রকৃত কথা বুঝতে পারছি। অর্জুন নিশ্চয়ই উর্বশীর জবরজং বেশভূষা দেখে ভয় পেয়েছিলেন। অন্যান্য অপ্সরাদের কথাও আমার মনে পড়েছে। গঙ্গাদ্বারে তপস্যারত ভরদ্বাজের তপোভঙ্গ করেছিলেন সিক্তবসনা ঘৃতাচী। বিবসনা মেনকা বিশ্বামিত্রর মনোহরণ করেছিলেন এবং তাঁদের কন্যা শকুন্তলা এক খণ্ড বল্কলে তার রূপ-যৌবন আবৃত করতে পারে নি বলেই মুগ্ধ মহারাজা দুষ্মন্ত তাকে গন্ধর্ব বিবাহ করতে কাল বিলম্ব করে নি। এই বারে আপনিই বলুন দেবরাজ, মর্ত্যের এই প্রগতির ইতিহাস জানা অর্জুন উর্বশীকে দেখে ভয় পাবে না কেন? আর কুম্ভীপাকের বর্তমান সমাজ মা বললে চটবে নাই বা কেন? সত্যিই এ তো রমণীর অপমান! উর্বশীও অপমানিত বোধ করে নপুংসক হবার শাপ দিয়েছিল অর্জুনকে। পত্রনবিসবাবু বললেনঃ কুম্ভীপাকে কোন মহিলার বয়স আপনি অনুমান করতে পারবেন না। আশি বছরের বুড়িও যাতে ষোড়শী সাজতে পারে, তার সমস্ত উপকরণ কুম্ভীপাকে কিনতে পাওয়া যায়। স্ফীতোদরী মন্দোদরী হতে পারে। দেহটা চাঙ্গা করবারও উপায় আছে। পরচুলা, নকল দাঁত, তারপরে রঙের খেলা, সব শেষে সৌরভ।

কেন জানি না দেবরাজ, হিড়িম্বা রাক্ষসীর কথা আমার মনে পড়ে গেল। রূপলাবণ্যবতী সুন্দরীর বেশে এসে সে শুধু ভীমেরই মনোহরণ করে নি, শাশুড়ি কুন্তীকেও ভোলাতে পেরেছিল। তাই আমার মনে

হল যে কুম্ভীপাকের এই বিদ্যা অনেক আগে মর্ত্যেও প্রচলিত ছিল।

পত্রনবিসবাবু আমাকে তাই উপদেশ দিলেন: প্রথম দর্শনেই মহিলাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করবেন না। বন্ধুর মতো ব্যবহার করবেন। মহিলারাও তো সব বয়সের ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপনের জন্যেই কুমারী কন্যার মতো সাজসজ্জা করছেন!

তারপরেই তিনি তাঁর হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে চঞ্চল হয়ে বললেন: দেখুন কাণ্ড! আপনার সঙ্গে বাজে গল্প করতে গিয়ে কাজের কথাটাই ভুলে গিয়েছিলাম। খেলা বোধহয় আরম্ভ হয়ে গেছে!

বলে কাঁধ থেকে ঝোলানো একটা থলে থেকে ছোট একটি যন্ত্র বার করে সেটি চালু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে খেলার ধারা বিবরণী শুনতে পাওয়া গেল। দেবরাজ, আমার মনে হল যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে ব্যাসদেব এই রকমই একটি যন্ত্র সঞ্জয়কে দিয়েছিলেন। সঞ্জয় সেই যন্ত্রে যুদ্ধের বিবরণ শুনে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু পত্রনবিসবাবু বললেন: কুম্ভীপাকে এই ট্রান্‌জিস্টার রেডিও এখন পুরনো হয়ে গেছে। ইচ্ছা করলে আমি ঘরে বসে টেলিভিশনে খেলা দেখতে পারতাম। কিন্তু খেলার মাঠের ভিতরের খবরের চেয়ে বাইরের খবরই তো আমাদের বেশি দরকার। তাই বাইরে বসে ট্রানজিস্টারে খেলার বিবরণ শুনতে হচ্ছে।

হঠাৎ আমাদের সামনের পথ দিয়ে অশ্বারোহী পুলিশ বাহিনীকে যেতে দেখে পত্রনবিসবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাই দেখে আমি বললাম: কী হল?

ভদ্রলোক বললেন: কোন গোলমালের আশঙ্কা আছে।

কেন?

মাঠের দরজায় তো অশ্বোরোহী পুলিশ ছিলই। আরও যখন আসছে তখন ব্যাপারটা জমবে বলে মনে হচ্ছে।

বলেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন। আমি দেখতে পেলাম যে জনকয়েক যুবক যুবতী আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল।

পত্রনবিসবাবু তাঁদের সঙ্গে ছুটতে ছুটতেই কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে ফিরে এসে হাঁপাতে লাগলেন। এই কাণ্ড দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: ব্যাপারটা কী?

মাঠের দরজায় তো অশ্বারোহী পুলিশ ছিলই।

কিছু সুস্থ হয়ে তিনি বললেন: চিত্রনগরীর বিখ্যাত তারকা সুদর্শন পাত্র এসে সামনের ঐ হোটেলে উঠেছেন। তিনি আজ খেলা দেখবেন।

তা জনতা এ সব খবর আপনাদের আগে পায় কী করে?

সেটাই তো আশ্চর্যের কথা। এত চেষ্টা করেও দেখি যে আমরা সব সময়েই বাসি খবর ছাপি।

এইবারে আমরা দেখতে পেলাম যে হোটেলের সামনের রাজপথে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। সুদর্শন পাত্রকে দেখবার জন্যে বিশাল জনসমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে। জানতে পারলাম যে চলচ্চিত্রই এখন কুম্ভীপাকের জনতাকে প্রাণশক্তি যোগাচ্ছে। এই সুদর্শন পাত্র নাকি নগ্নপ্রায় রমণীর সঙ্গে নৃত্যগীতে অসাধারণ পটু। খালি হাতে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তার জুড়ি নেই। ছোরাছুরি বন্দুক হাতে অসংখ্য গুণ্ডার হাত থেকে যে কোন রমণীকে সে উদ্ধার করে আনতে পারে। জনতা

তাকে কৃষ্ণ না বলে গুরু বলে কেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। পত্রনবিসবাবু মনোযোগ দিয়ে খেলার বিবরণ শুনছিলেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ছিল রাজপথের জনতার দিকে নিবদ্ধ। পরে আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে এখানে হাতঘড়ির মতো ট্রানজিস্টারও একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য। দরিদ্র জনগণও একটি চাকরি পেলে প্রথমেই একটি ঘড়ি, তারপর ট্রানজিস্টার ও শেষে একটি সাইকেল নামের দ্বিচক্রযান কেনে। পরিবার কোন বস্তির মধ্যে বহু কষ্টে নানা অভাবে ও অর্ধাহারে থাকলেও এ সব জিনিস আগে চাই। হাতে ঘড়ি বেঁধে ট্রানজিস্টারে চলচ্চিত্রের গান শুনতে শুনতে পথ চলা একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি। শহরের উপকণ্ঠে ট্রানজিস্টার নিয়ে সাইকেলে চেপে চলা তো একটা অভিজাত ব্যাপার। পূর্বে এ সব যন্ত্র অন্যান্য নরক থেকে আমদানি হত। এখন তাদের সহযোগিতায় কুম্ভীপাকেই এই সব যন্ত্র তৈরি হচ্ছে। কুম্ভীপাকের বৈজ্ঞানিকেরা এখন দেশ বিদেশ থেকে নানা রকমের আবিষ্কার শিখে আসছে। কিন্তু নিজেরা নতুন কিছু আবিষ্কার করার কাজকে তারা সম্মানের চোখে গ্রহণ করছে না। গবেষণার নামে অপর্যাপ্ত সরকারী পয়সা নিয়ে বিদেশে স্ফূর্তি করে বেড়াচ্ছে।

এই সময়ে হঠাৎ একটা বোমা বিস্ফোরণের শব্দে আমরা দুজনেই এক সঙ্গে চমকে উঠলাম। পরক্ষণেই দুমদাম গুড়ুম গুড়ুম শব্দ। রাজপথের জনতাকে তারপর মাঠের দিকে মরীয়া হয়ে ছুটতে দেখলাম। পত্রনবিসবাবু সকৌতুকে বললেন: সুদর্শন পাত্রকে পুলিশ বোধহয় লুকিয়ে খেলার মাঠে পৌঁছে দিয়েছে। এইবারে মাঠের খেলা জমে উঠবে।

দেখতে না দেখতেই মাঠের দরজায় আর একটি বোমা ফাটল এবং ক্রুদ্ধ জনতা বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করল সেই দরজা। পত্রনবিসবাবু বললেন: সর্বনাশের আর দেরি নেই। ভেতরেও গোলমাল শুরু হয়ে গেছে।

কী রকম?

এক পক্ষ গোল দিয়েছে, আর অন্য পক্ষের সমর্থকরা মাঠে ঢুকে পড়েছে। বেচারা রেফারির প্রাণটা না যায়!

দেবরাজ, বড় বিপজ্জনক এই খেলার পরিচালক রেফারির কাজ। তাঁকে অন্তর্জলি যাত্রায় নিয়ে যাবার জন্যে হাসপাতালের গাড়ি সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা তাই গভীর উদ্বেগে ধারা-বিবরণী শুনতে লাগলাম। –

গেল গেল, খেলা ভণ্ডুল হয়ে গেল। রেফারিকে স্ট্রেচারে করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর আর—শুনতে পাচ্ছি– পুলিসের বহর দেখে সন্দেহও হচ্ছে—সুদর্শন পাত্র নাকি খেলা দেখতে এসেছেন ছদ্মবেশে। হ্যাঁ। মার মার করে এই বারে বাইরের জনতা মাঠে ঢুকছে। আমাদেরও আজ বোধহয় পরিত্রাণ নেই। – গেল গেল, সব গেল—মচ্ মচাং—কড় কড়াৎ—আমরা পালাচ্ছি।

তারপরেই একটা বিশ্রী বিকট শব্দ করে ধারা-বিবরণী স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু পত্রনবিসবাবু নির্বিকার চিত্তে যন্ত্রটি বন্ধ করে কাঁধের থলেয় পুরে বললেন: আজকের মতো ছুটি হয়ে গেল।

সমাচার পত্রনবিস এবারে আমাকে হিড়হিড় করে ময়দানের আর এক প্রান্তে টেনে এনে একটা নির্জন জায়গায় বসলেন। বললেন: এখন আর আমাদের প্রাণের ভয় নেই। গোলমালটা থামুক। ভিড় হাল্কা হোক। তারপরে আমরা এগোব।

বলে আর একটা সিগারেট ধরালেন।

এই সিগারেট শেষ হবার আগেই দিনের আলো নিবে গেল। অন্ধকার হল আকাশ। কিন্তু পথঘাট অন্ধকার হল না। দিনের আলোর চেয়েও উজ্জ্বল আলোয় চারি দিক ঝলমল করে উঠল। আর সে কি চন্দ্র সূর্যের মতো এক রঙের এক ঘেঁয়ে আলো! নানা রঙের আলো নানা ভাবে চিত্র বিচিত্র হয়ে জ্বলছে। নিবছে, আবার জ্বলছে। বড় বড় আলোর চোখ মেলে নানা আকারের যান রাজপথ ধরে ছুটছে।

রাতের কুম্ভীপাক যে দিনের চেয়েও মোহিনী তা এখানে বসেই উপলব্ধি করলাম। সমাচার পত্রনবিস পোড়া সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে বললেন: চলুন এইবারে, গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া যাক।

সারা দিন ঘুরে আমারও তৃষ্ণা পেয়েছিল। আমি তাই খুশী হয়ে তাঁর সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। এক জায়গায় এসে একটি উঁচু বেদীর উপরে একটি পাথরের মূর্তি দেখলাম একজন ভিখারীর। আশ্চর্য হয়ে আমি তাঁকে বললাম: বেদীর ওপরে ভিখারীর মূর্তি!

পত্রনবিসবাবু বললেন: ভিখারীর নয়, ইনি আমাদের জাতির পিতা। এঁকেই সামনে রেখে এঁরই আদর্শে আমাদের নেতারা কুম্ভীপাক শাসন করছেন। এই শীর্ণ দেহের মানুষটি এক ফালি কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করে অর্ধাহারে ও উপবাস করে আমাদের দেশ স্বাধীন করেছিলেন। নেতারা তাই সমগ্র জাতির জন্যেই তাঁর আদর্শ পাকা করেছেন। এক ফালি কাপড় পরে অর্ধাহারে ও উপবাস করে তারা বেঁচে থাকবে। কোন দিন তারা পেট ভরে খেতে চাইবে না, আর লজ্জা নিবারণের জন্যে যতটুকু দরকার তার বেশি কাপড় তারা কোন দিন ব্যবহার করবে না।

কিন্তু পতিতজীবন জানার কথা আমার মনে পড়ে গেল। তাঁর গৃহে আমি চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় খেয়েছি এবং তাঁরই সঙ্গে বিধান সভায় এসে কাউকে আমি এই বেশে দেখি নি।

পত্রনবিসবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন: আপনি কি নেতাদের কথা ভাবছেন? এ নিয়ম তো তাঁদের জন্যে নয়। আর কেউ যাতে কোন সমালোচনা করতে না পারে, তার জন্যে কুম্ভীপাকের জনসাধারণকে অশিক্ষিত রাখার ব্যবস্থাও পাকা করা হয়েছে। আসুন এই দিকে।

বলে তিনি আমাকে সামনের রাজপথ ধরে টেনে নিয়ে চললেন।

এই পথের দুধারে বড় বড় অট্টালিকায় ঝলমলে দোকান ও রেস্তোরাঁ। পত্রনবিসবাবু বললেন: এই সব রেস্তোরাঁয় চা খেতে

ঢুকলে আমাদের পরণের কাপড়খানাও খুলে নেবে।

কেন?

দেখতে চান নাকি!

বলে তিনি একটি রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়ালেন। আমি দেখলাম যে বড় বড় মোটরগাড়ি এসে রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছে। স্ত্রীপুরুষ আসছে জোড়ায় জোড়ায়। পুরুষদের বিদেশী পোশাক, নিজের কণ্ঠটি তাঁরা নানা রঙের দড়ি দিয়ে বেঁধে এসেছেন। তক্‌মা-আঁটা দ্বারপাল দরজার একটি পাল্লা খুলে ধরছে তাঁদের জন্যে। আর সেই ফাঁক দিয়েই আমরা ভিতরের দৃশ্য কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছি। নামে ভোজনালয়; কিন্তু কাজে রঙীন প্রজাপতির মেলা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: পুরুষরা তাদের কণ্ঠটি রঙীন দড়ি দিয়ে বেঁধেছে কেন?

পত্রনবিসবাবু তৎপর ভাবে উত্তর দিলেন: ঐ দড়ি ধরে বান্ধবীরা তাঁদের যথেচ্ছ ঘোরাতে পারবেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: বান্ধবী! ঐ মহিলারা কি ওদের স্ত্রী নন।

পাগল হয়েছেন আপনি! এ কালে কি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে স্ফূর্তি হয়! অবশ্য ওঁদের স্ত্রীরাও বাড়িতে বসে নেই। তাঁরাও হয়তো অন্যের স্বামীর সঙ্গে কিংবা কোন উঠতি ছোঁড়ার সঙ্গে এই পাড়াতেই এসেছেন। আকণ্ঠ সুরাপান করে নৃত্য করবেন এবং পদস্খলন না হলে নিজ নিজ গৃহেই ফিরে যাবেন।

শ্বেতকেতুর কথা আমার মনে পড়ে গেল। এক ঋষি এসে তাঁদের সামনে থেকে তাঁর মাতাকে তুলে নিয়ে যাবার জন্যে বালক বয়সেই তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন এবং সতীধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন মর্ত্যে। কুম্ভীপাকে দেখছি শ্বেতকেতুর পূর্বের যুগই চলেছে। তাই এ বিষয়ে কোন মন্তব্য না করে আমি বললাম: কিসের কোলাহল শুনতে পাচ্ছি?

কোলাহল! নাচ গানকে আপনি কোলাহল ভাবছেন? পারি নে

আপনাকে নিয়ে।

বলে তিনি আমাকে টেনে নিয়ে আবার এগিয়ে চললেন।

এক জায়গায় আমাদের দাঁড়াতে হল। ভিড় জমেছে সেখানে, আর হাসপাতালের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। পত্রনবিসবাবুর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন : কোন ভিখিরি বোধহয় গাড়ি চাপা পড়েছে। কেন যে এরা এ সব জায়গায় ভিক্ষে করতে আসে! বোঝে না তো যে পয়সা যাদের আছে, তারা অপরকে তা দেয় না।

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

কিন্তু এবারে যে তিনি ভুল বুঝেছেন তা পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম। সামনের রেস্তোরাঁর চওড়া দরজার দুটো পাল্লাই এক সঙ্গে খুলে গেল। আর চার ব্যক্তি এক হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোককে স্ট্রেচারে বয়ে এনে হাসপাতালের গাড়িতে তুলে দিল। খেতে খেতেই ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, ধড়ে প্রাণ আছে কিনা তা পরীক্ষার জন্যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ভিতর থেকে যাঁরা বেরিয়ে এসেছিলেন, তাঁদেরই একজনকে পত্রনবিসবাবু প্রশ্ন করলেন : কী নাম এই ভদ্রলোকের?

তিনি বললেন : সর্বভুক সামন্ত। বেশি খেয়েই মারা গেলেন।

পত্রনবিসবাবু চমকে পিছিয়ে আসতেই আমি বললাম : তাঁর পরিবারকে কে খবর দেবে?

পত্রনবিসবাবু গম্ভীর মুখে বললেন : জানি নে। তাঁর বান্ধবী হয়তো এতক্ষণে অন্য কারও কাঁধ ধরে ঝুলে পড়েছেন।

একটু থেমে আবার বললেন : ভালই করেছেন! স্ফূর্তি করতে বেরিয়ে উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে লাভ কী!

এইবারে আমরা প্রশস্ত রাজপথ ছেড়ে একটি অন্ধকার পথে ঢুকলাম। উজ্জ্বল আলো থেকে এসে প্রথমটায় অন্ধকারই মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখলাম যে সে পথেও আলো আছে। প্রখর নয় এই আলো।

একটুখানি এগিয়ে একটা চায়ের দোকানের সামনে এসে পত্রনবিসবাবু বললেন : ভিড় দেখছেন এখানে ?

বললাম : বসবার জায়গা একটিও খালি নেই দেখছি।

চা এখানে চায়ের দামে পাওয়া যায় বলেই এই ভিড়। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেই বসবার জায়গা পাওয়া যাবে।

সত্যিই তাই। একটুখানি অপেক্ষা করেই আমরা বসবার জায়গা পেলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে চা। কুম্ভীপাকের অমৃত! এক পেয়ালা খেয়েই দেহ মন চাঙ্গা হয়ে উঠল।

এবারে পথে নেমেই পত্রনবিসবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : এবারে আপনি কোথায় যাবেন ?

চিন্তিত ভাবে আমি বললাম : তা তো জানি নে!

ভদ্রলোক বললেন : আমাকে তো এবারে অফিসে ছুটতে হবে! চলুন, আপনাকে বড় রাস্তায় পৌঁছে দিয়ে যাই।

বলে একটুখানি এগোবার পরেই আমি লাফিয়ে পিছিয়ে এলাম। আর পত্রনবিসবাবু থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কী হল ?

ভয়ে ভয়ে আমি বললাম : পায়ে কী একটা তকতকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা—

পত্রনবিসবাবু এক নজরে কিছু পরীক্ষা করেই চাপা গলায় বলে উঠলেন : তাড়াতাড়ি চলে আসুন।

কিন্তু আমরা এগোতে পারলাম না। আড়াল থেকে এক ব্যক্তি খসখসে ভাঙা গলায় বলল : বাবুরা ভয় পেলেন নাকি ?

পত্রনবিসবাবু কোন রকমে বললেন : ভয়! ভয় পাব কেন ?

দুজনেই তো ভয় পেয়েছেন দেখছি। কিন্তু আপনাদের কোন ভয় নেই। পেত্নী হয়ে মা আপনাদের ঘাড় মটকাবেন না।

তোমার মা মারা গেছেন ?

আমার মা নয় বাবু, আমি তো গলিতকুষ্ঠ ফুটপাথী। ইনি হলেন দোর্দণ্ড প্রতাপ সিংহের মা।

পত্রনবিসবাবু এবারে যেন তাঁর চোখের সামনে ভূত দেখতে পেলেন। বললেনঃ তুমি বলছ কী!

ফুটপাথী বললঃ ঠিকই বলছি বাবু, ও পাড়ায় এক দিন ভিক্ষে করতে গিয়ে দেখেছিলাম, মা আমার ফুটপাথে বসে কাঁদছে।

কেন?

এত দিন চাকরদের একটা ঘরে থাকতেন। এখন সেই ঘরে সাহেবের নতুন কুকুর থাকবে বলে মাকে পথে বার করে দিয়েছেন। কিন্তু—

গলিতকুষ্ঠ ফুটপাথী হাউ-মাউ করে খানিকক্ষণ কাঁদল। তারপরে শান্ত হয়ে বললঃ মাকে আমার বাঁচাতে পারলাম না বাবু, আর সৎকারের ব্যবস্থাও এখনও করতে পারি নি।

গভীর বিস্ময়ে আমি পত্রনবিসবাবুর দিকে তাকালাম। তিনি আমাকে চুপি চুপি বললেনঃ আমাদের মালিকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ ব্যাপারে আমার জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না।

কিন্তু আশ্চর্য হলাম ফুটপাথীর কথা শুনে। সে বললঃ আপনাদের কিছু করতে হবে না বাবু। ও দিকের বস্তিতে খবর দিয়ে এসেছি। তারাই ব্যবস্থা করছে।

আমি বললামঃ কী ব্যবস্থা?

সে বললঃ হাসপাতালের গাড়ি আসবে না, আর সৎকার সমিতি আমাদের জন্য নয়। বস্তির মাতালরা একটা খাটিয়া নিয়ে আসছে। নতুন কাপড় আর ফুল কিনতে বোধহয় দেরি হচ্ছে। পয়সার দরকার তো! এ দিকে ঐটেরই শুধু অভাব, অন্য কিছুর অভাব নেই।

আমরা কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। গলিতকুষ্ঠ ফুটপাথীই সমাধান করে দিয়ে বললঃ আপনারা নিজেদের কাজে যান বাবু, আপনাদের কিছু করতে হবে না। দু দণ্ড দাঁড়িয়ে সব জেনে গেলেন বলে আপনাদের ধন্যবাদ।

পত্রনবিসবাবু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাড়াতাড়ি খানিকটা

পথ পেরিয়ে এসে বললেন : বাঁচা গেল।

কিন্তু আমি বললাম : বস্তিটা কি বস্তু মশায় ?

দেখবেন ?

বলে তিনি আমাকে একটা অন্ধকার গলির মধ্যে টেনে নিয়ে চললেন। আর একটু এগিয়েই দেখতে পেলাম যে কোন দিক থেকেই আর আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। স্যাঁৎ সেঁতে বাতাসে শরীর শিরশির করে উঠল। নানা রকম দুর্গন্ধে নাক জ্বালা করে উঠতেই নামাবলী দিয়ে আমি নাক মুখ ঢাকলাম। তারপরেই নানা রকমের চিৎকার শুনতে পেলাম। পুরুষের গর্জন, স্ত্রীলোকের ক্রন্দন ও শিশুদের আর্তনাদ। এই কি পুরাতন কুম্ভীপাক! এইখানেই কি যমদূতেরা পাপীদের শাস্তি বিধান করছে ? যুধিষ্ঠির কি এই পর্যন্ত এসেই পালিয়ে গিয়েছিলেন ?

ভয়ে ভয়ে পত্রনবিসবাবুকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?

কেন, আপনিই তো বস্তি দেখতে চাইলেন!

আমি আঁৎকে উঠে বললাম : না না, বস্তি দেখতে আমি চাই নে। এ যে নরক! কুম্ভীপাকে এখনও নরক আছে ?

পত্রনবিনবাবু বললেন : একে নরক বলছেন কেন ? এই নরকবাসীরাই তো দোর্দণ্ড প্রতাপ সিংহের মায়ের সৎকার করতে যাচ্ছে। ওরা তাঁকে স্বর্গে পাঠাতে চায়।

এবারে পত্রনবিসবাবুর হাত ধরে আমি তাঁকে ফিরিয়ে আনলাম।

সমাচার পত্রনবিস বললেন : আর কিছু দেখতে চান ?

বললাম : বৈতরিণীর তীরে কিছুক্ষণ বসতে ইচ্ছা করছে।

তিনি বললেন : আমার তো সময় নেই! আমি আপনাকে বৈতরিণীর পথটা দেখিয়ে দিচ্ছি।

বলে আমাকে সেই পথ দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

নির্জন পথে হাঁটতে হাঁটতে আমি বৈতরিণীর তীরে পৌঁছে গেলাম। এক জায়গায় বসে আমি এই নদীর রূপ দেখতে লাগলাম। স্নিগ্ধ বাতাসে আমার শরীর ও মন জুড়িয়ে গেল।

সহসা অন্ধকারে আমি একটি ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম অদূরে। মনে হল, এত রাত্রে একটি তরুণী মেয়ে এসেছে স্নানের জন্যে। জলে নেমে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু এ কি! এ কী করছে মেয়েটা? ডুবে যাবে যে জলে! কিন্তু সে দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই কেন? ক্রমাগতই কেন এগিয়ে যাচ্ছে! সে কি জলে ডুবে মরতে চায়?

এ কথা মনে হতেই আমি নামাবলী রেখে জলে লাফিয়ে পড়লাম। ডুবন্ত মেয়েটাকে কোন রকমে টেনে তুললাম তীরে। কোথা থেকে এক টুকরো আলো এসে পড়েছিল তার মুখে। চাঁদ নেই, বোধহয় তারার মিটমিটে আলো। সেই আলোতেও আমি তাকে চিনতে পেরে চমকে উঠলাম। মুখের কাছে মুখ নামিয়ে ডাকলাম: বীণা!

সেবিকা সৎপথী তার জ্ঞান হারায় নি। চোখ মেলে আমাকে দেখে সেও চমকে উঠে বলল: ঠাকুরমশায় আপনি!

বললাম: আত্মহত্যা করে তুমি কোথায় যাবে বীণা? কুম্ভীপাক থেকে তোমার আত্মার তো যাবার জায়গা নেই! এক দিকে রৌরব তামিস্র প্রভৃতি একুশটি নরক, অন্য দিকে ক্ষার কর্দম প্রভৃতি সাতটি নরকের কোথায় তুমি আশ্রয় পাবে?

তবে আমি কী করব?

কী করবে!

আমি ব্রহ্মপুত্র দেবর্ষি। লোকে আমাকে ত্রিকালজ্ঞ বলে। সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ত্রিলোকের কত জনকে আমি উপদেশ দিয়েছি। কিন্তু আজ কুম্ভীপাকের এই বৈতরিণীর তীরে নিজেকে বড় অসহায় মনে হল। সেবিকা সৎপথীকে কী উপদেশ দেব তা ভেবে পেলাম না।

সেবিকা সৎপথী এক সময়ে বলল: যোগী মহারাজের এক শিষ্যার

হাতে পায়ে ধরে সর্বস্বার্থ ত্যাগী মশায়ের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দেখে বললেন, এ ভি মহারাজকি শিষ্যা হ্যায় ? আমি তা নই শুনে বললেন, মাতৃভাষা ছোড় কর রাষ্ট্রভাষা শিখিয়ে। তব্ রাজধানী মে আ কর মুঝ্‌সে মিলিয়ে।

হ্যাঁ দেবরাজ, কুম্ভীপাকে এখন রাষ্ট্রভাষা চালু হয়েছে। সেই ভাষায় কথা বলতে না পারলে কারও কিছু হবে না।

সেবিকা সৎপথী এইবারে কেঁদে উঠল, বলল : চুপ করে থাকবেন না ঠাকুরমশায়, বলুন আমি কী করব ?

হরিকে আমি স্মরণ করে মনে মনে বললাম : ঠাকুর, আমার মুখ রাখো।

দেবরাজ, কে বলে হরি বেঁচে নেই ? তিনি বেঁচে আছেন বৈকি ! তা না হলে আমার এই চরম অপমানের সময়ে ধেনো জহ্লাদ এসে উপস্থিত হবে কেন ! এসেই সে বলল : আরে, এ যে আমাদের ঠাকুরমশায় !

চোখে আমার জল এসে গেল। বললাম : বাবা ধেনো, বড় বিপদে পড়েছি বাবা !

বিপদ ! আপনার আবার বিপদ কিসের ?

বললাম : এই মেয়েটিকে নিয়ে বিপদ। তুমি মারলে দীনবন্ধু ভদ্রকে, আর সেই অপরাধে মেয়েটার চাকরি যাচ্ছে।

ধেনো জহ্লাদ গম্ভীর হয়ে সব কথা শুনল। তার পরে বলল : তোমার কোন ভয় নেই মা, ধেনোর মতো ছেলে থাকতে তোমার গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না।

তাড়াতাড়ি আমি বললাম : ওকে মা বোলো না ধেনো, ওর অপমান হবে।

সেবিকা সৎপথী তখনই বলল : অপমান কিসের ঠাকুরমশায় ! ও তো মা বলে আমাকে সম্মানই করছে। কত নিশ্চিন্ত হলাম বলুন !

আমার বুদ্ধি কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। আজই যা শিখেছিলাম

তা উল্টে গেল এক মুহূর্তে! কিন্তু কিছু বলবার সুযোগ পেলাম না। খেনো জহ্লাদ বলল: আমি এক্ষুনি যাচ্ছি বড় ডাক্তারের বাড়ি। কাল সকালেই তুমি চাকরিতে যোগ দেবে মা।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললাম: সেও কি সম্ভব?

খেনো জহ্লাদ বলল: কুম্ভীপাকে সবই সম্ভব ঠাকুরমশায়! সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না বলে আঙুলটা একটু বেঁকাতে হয়। বড় ডাক্তার খেনো জহ্লাদকে চেনে। এই তো একটু আগে মাকে পোড়াবার কাঠ পাচ্ছিল না বলে মাতালরা এসেছিল। মা এখন বিজলীর চুলোয় পুড়ছেন বিনি পয়সায়।

তারপরেই সেবিকা সংপথীকে বলল: আচ্ছা মা, কাল সকালে তোমার বুড়ো ছেলে হাসপাতালের সিঁড়িতে বসে থাকবে। কোন অসুবিধা হলেই আমাকে বোলো।

বলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল খেনো জহ্লাদ। আর খুশিতে ছলছল করে উঠল বৈতরিণীর জল!

আজ এই পর্যন্তই থাক, দেবরাজ। ইতি—আপনার বশংবদ দেবর্ষি।